বরাক উপত্যকার আখড়ার ইতিবৃত্ত

কলা অনুষদ্-এর অন্তর্ভুক্ত

বাংলা ভাষায়

ক্ষুদ্রতর গবেষণা সন্দর্ভের প্রতিবেদন

২০১৪-১৫

পঞ্জিয়ন নং- এফ. ৫-২১৪/২০১২-১৩/এম. আর. পি./এন. ই. আর. অ'/৭৭২
তারিখ- ০২ মে' ২০১৩

পৃষ্ঠপোষক - বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউ. জি. সি.)

গবেষক

অজিত কুমার সিংহ

এম. এ. (বাংলা), এম. ফিল., পিএইচ. ডি.

বাংলা বিভাগ

এ.ডি.পি. কলেজ, নগাঁও ঃ অসম

পিন-৭৮২০০২

OFFICE OF THE PRINCIPAL
ANANDARAM DHEKIAL PHOOKAN COLLEGE
Nagaon, Pin- 782002 (Assam)
Estd. 1959

From : *Dr. S. U. Ahmed*, M.Sc., Ph.D.
Principal & Secretary

Mob. : 94350-68923
Ph. : 222235 (O)
Fax : (03672) 225285
Website : www.adpcollege.org.in
e_mail : principaladp@gmail.com

Ref. No. ADPC/ 429/2015-16 *Date* 30/9/2015

CERTIFICATE

This is to certify that Dr. Ajit Kumar Singha, Assistant Professor in the Deptt. of Bengali of this institution has completed a Minor Research Project entitled "Barak Upatyakar Akhrar Itibritta" granted by UGC - NERO, Guwahati (Assam) following the norms framed by the UGC.

Principal
A.D.P. College
Nagaon (Assam)
Principal,
ADP College
Nagaon : Assam

OFFICE OF THE PRINCIPAL
ANANDARAM DHEKIAL PHOOKAN COLLEGE
Nagaon, Pin- 782002 (Assam)
Estd. 1959

From : *Dr. S. U. Ahmed, M.Sc., Ph.D.*
Principal & Secretary

Mob. : 94350-68923
Ph. : 222235 (O)
Fax : (03672) 225285
Website : www.adpcollege.org.in
e_mail : principaladp@gmail.com

Ref. No. ADPC/430/2015-16 *Date* 30/9/15

To,

The Joint Secretary
UGC - NERO
Beltola-Basistha Road
Guwahati - 6

Sub. :- Submission of Final Report of MRP granted by your vide letter No. F.5-214/2012-13/MRP/NERO/772, dated 03-05-2013 to Dr. Ajit Kumar Singha.

Sir,

With reference to your letter No. F.5-214/2012-13/MRP/NERO/772, dated 03-05-2013, I have the honour to forward herewith the Final Report of MRP granted to Dr. Ajit Kumar Singha, Assistant Professor, Deptt. of Bengali of our College with the statement of accounts relating to this expenditure.

I request your honour kindly to arrange for payment of the balance money as granted to Dr. Ajit Kumar Singha.

Yours faithfully,

Principal
A.D.P. College
Nagaon (Assam)

Principal,
ADP College
Nagaon : Assam

OFFICE OF THE PRINCIPAL
ANANDARAM DHEKIAL PHOOKAN COLLEGE
Nagaon, Pin- 782002 (Assam)
Estd. 1959

From : *Dr. S. U. Ahmed, M.Sc., Ph.D.*
Principal & Secretary

Mob. : 94350-68923
Ph. : 222235 (O)
Fax : (03672) 225285
Website : www.adpcollege.org.in
e_mail : principaladp@gmail.com

Ref. No. ADPC/428/2015-16 *Date* 30/9/2015

To,

The Joint Secretary
UGC - NERO
Beltola-Basistha Road
Guwahati - 6

Sub. :- Submission of Final Report of Minor Research Project completed by Dr. Ajit Kumar Singha of A.D.P. College, Nagaon

Sir,

With profound respect, I am forwarding herewith of Final Report of MRP granted to Dr. Ajit Kumar Singha of this institution, vide your No. F.5-214/2012-13/MRP/NERO/772, dated 03-05-2013 completed within prescribed period.

Dr. Ajit Kumar Singha has completed his project according to the UGC norms.

I request your honour kindly to send the SETTLEMENT LETTER after the completion of the official procedure.

With sincere regards.

Yours faithfully,

Principal
A.D.P. College
Nagaon (Assam)

Principal,
ADP College
Nagaon : Assam

ASSETS CERTIFICATE

It is certified that the following Equipments has been handed over to the College:

1) Canon Digital Camera 2) Compaq Laptop

3) _____ 4) _____

Signature of the Principal
with seal Principal,
ADP College
Nagaon : Assam

Signature of the Principal Investigator

ACCESSION CERTIFICATE

It is certified that the Books purchased from MRP grant are handed over to the college central/ departmental library. Their Accession number is from D803 to D815

Signature of Principal
Investigator

Librarian
A.D.P.College, Nagaon
Signature of the Librarian
with seal

Signature of the Principal
with seal Principal,
ADP College
Nagaon : Assam

প্রাক্‌কথন

বৈষ্ণবধর্ম অতি প্রাচীন ধর্ম। বৈদিক যুগের সময় থেকেই মানব সমাজে বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত। এই বৈষ্ণবধর্মকে মূলত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এই চারটি শ্রেণি মূলত চারজন বৈষ্ণব প্রবক্তার নামানুসারে ভাগ করা হয়েছে। ১৪৮৬ খ্রিঃ বঙ্গভূমিতে মহাপ্রভুর জন্মের পর আমরা এক উদার বৈষ্ণব ধর্মের পরিচয় পাই। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের উদার বৈষ্ণব ধর্মের আকর্ষণে নানাজাতি, নানাবর্ণের মানুষ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। চৈতন্যের সমসাময়িক সময়ে কিংবা পরবর্তীকালে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম থেকে অনেক উপসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে।

চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম ও এই ধর্ম প্রচার ও প্রসারে বৈষ্ণব বা বৈরাগীরা গড়ে তোলেছেন আখড়া। এই আখড়া হল বৈরাগীদের বাসস্থান। এ ধরনের আখড়া প্রচুর রয়েছে বরাক উপত্যকায়। বরাক উপত্যকায় স্থাপিত আখড়ার ইতিহাস সবিস্তারে সর্বসাধারণের সামানে তোলে ধরাই আমার মূল উদ্দেশ্য। আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সর্বসাধারণের সামনে তোলে ধরতে মূল অভিসন্দর্ভটিকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। যতটুকু সম্ভব এই তিনটি অধ্যায়ে আখড়া বিষয়ক একটি অভিসন্দর্ভ তৈরি করতে পেরেছি বলে আমার মনে হয়।

যাই হোক, বরাক উপত্যকার আখড়াকে কেন্দ্র করে কোনো সাহিত্যিক প্রতিবেদন, গবেষণা কিংবা পুস্তক রচনা আজ পর্যন্ত হয়নি। এই পটভূমিকায় এ ধরনের একটি গবেষণা সন্দর্ভ রচনা করা সহজসাধ্য কাজ নয়। হয়তো আমার স্বর্গপ্রাপ্ত মা-বাবার (ঁসুশীলা রাণি সিংহ ও ঁঅক্ষয়কুমার সিংহ) অদৃশ্য আশীর্বাদ আমার উপর রয়েছে। এ ছাড়া ক্ষেত্র সমীক্ষায় ও তথ্য সংগ্রহে প্রত্যক্ষ ভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ ভাবে তারা হলেন বন্ধুবর শ্রীশশধর মালাকার, মানসকান্তি চক্রবর্তী, সুশীল দাস, রিঙ্কু মালাকার ও সোমেশ পাল। তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণের জালে আবদ্ধ।

আমি 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে'র (UGC) আর্থিক সহায়তায় 'ক্ষুদ্রতর গবেষণা সন্দর্ভে'র প্রতিবেদনটি রচনা করতে সমর্থ হয়েছি। বিশেষত অর্থ মঞ্জুর করার জন্য কমিশনের কাছে অসীম কৃতজ্ঞতায় ঋণবন্দী।

কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই এ.ডি.পি. কলেজের অধ্যক্ষ ড° সরিফউদ্দিন আহমেদ, ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড° নিত্যানন্দ পট্টনায়েক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড° তপোধীর ভট্টাচার্য, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ড° বেলা দাস এবং আমার সহকর্মী প্রশান্ত গগৈকে।

ঘরের কথা হলেও, আমার সহমর্মিনী কল্পনা দাসসিংহ আমাকে প্রতিনিয়ম উৎসাহ জুগিয়ে গবেষণার কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই, এই সাহায্যের কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমি স্মরণ করছি। একমাত্র ছেলে অরিজিৎ ছোটোখাটো কাজের মাধ্যমে আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে। তাকে জানাই স্নেহ ও আশীর্বাদ।

সূচীপত্র

প্রাক্‌কথন ঃ

ভূমিকা ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১ - ২

প্রথম অধ্যায় ঃ আখড়ার উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রকর্ষ; ভারতীয় সনাতন মঠ-মন্দিরের উৎপত্তি ও বিকাশ; আখড়া ও মঠ-মন্দিরের মধ্যে মিল ও পার্থক্য; বৈষ্ণবদের শ্রেণিবিভাগ, তাঁদের জীবনযাত্রা এবং ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান— এই অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনার চেষ্টা করব। পৃষ্ঠা ঃ ৩ - ১১

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বরাক উপত্যকার পরিচয়; বরাক উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত আখড়ার পরিচয় ও ইতিহাস সবিস্তারে এই অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। পৃষ্ঠা ঃ ১২ - ৮৭

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বরাক উপত্যকার জনজীবনে আখড়ার প্রভাব, গুরুত্ব ও ভূমিকার কথা, বরাক উপত্যকায় আখড়া ও বৈষ্ণবকে কেন্দ্র করে সংগঠিত সাহিত্য-সংস্কৃতি-উৎসব-মেলার কথা; বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশে আখড়া নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে কি কি অসুবিধের সম্মুখীন এবং এই অসুবিধা বা সমস্যা সমাধানের উপায়— এই অধ্যায়ে তোলে ধরার প্রচেষ্টা করব। পৃষ্ঠা ঃ ৮৮ - ৯৪

উপসংহার ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৯৫ - ৯৬

পরিশিষ্ট ঃ ক্ষেত্র গবেষণার তথ্যসূত্র নির্দেশ পৃষ্ঠা ঃ ৯৬

গ্রন্থপঞ্জি ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৯৭ - ৯৮

কয়েকটি নির্বাচিত আখড়ার আলোকচিত্র ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৯৯ -১০৩

ভূমিকা

বৃহত্তর গাঙ্গেয় বাংলার ঈশান অঞ্চল আজকের বরাক উপত্যকা বিভিন্ন জাতি এবং ভাষিক গোষ্ঠীর বসবাসে পুষ্ট এক বৈচিত্র্যময় ভূখণ্ড। বরাক উপত্যকায় যেমন বসবাস করছেন নানাজাতি ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ তেমনি রয়েছে তাদের নিজস্ব ধর্মমত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মমত অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করছেন। কিন্তু এখানে একটি উল্লেখনীয় বিষয়, মধ্যযুগের ধর্মীয় টালমাটাল অবস্থায় নবদ্বীপে মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তী সময়ে মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসীদীক্ষা নিয়ে বৃন্দাবন ও পুরী সহ নানাস্থানে জীবযাপন করেছেন। সেইসঙ্গে নবরূপে বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্ব চারদিকে প্রচার করতে লাগলেন। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব খুব ধীর গতিতে শ্রীহট্ট সহ বরাক উপত্যকায় পড়েছে। গড়ে উঠেছে ধর্ম প্রচারের জন্য বৈষ্ণব গুরুদেবদের অর্থাৎ বৈরাগীদের সাধন-ভজনের স্থায়ী বাসস্থান বা ঘর। যাকে বৈষ্ণবীয় ভাষায় বলা হয় আখড়া। এই আখড়াকে মধ্যমণি রেখে গড়ে উঠেছে আমার গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভ 'বরাক উপত্যকার আখড়ার ইতিবৃত্ত'। এই ক্ষুদ্রতর গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে সবিস্তারে আলোচনা করার জন্য তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে যথাযথ আলোচনার প্রচেষ্টা করেছি।

তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত অভিসন্দর্ভটির প্রথম অধ্যায়ে আখড়ার উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রকর্ষ; ভারতীয় সনাতন মঠ-মন্দিরের উৎপত্তি ও বিকাশ; আখড়া ও মঠ-মন্দিরের মধ্যে মিল ও পার্থক্য; বৈষ্ণবদের শ্রেণিবিভাগ, তাঁদের জীবনযাত্রা এবং ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। বৈষ্ণবধর্ম কোন সময়ে আরম্ভ হয়েছে তার সঠিক তথ্য আমাদের হাতে না-থাকলেও চারজন বৈষ্ণব গুরুর নামে চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এরপরে চৈতন্য প্রবর্তিত উদার বৈষ্ণবধর্ম ও নানা-উপসম্প্রদায় এবং বৈষ্ণব গুরুদের সাধনাস্থল বা আখড়ার প্রভাব সমাজে কতটুকু পড়েছে এ বিষয়ে সবিস্তারে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, বরাক উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত আখড়ার পরিচয় ও ইতিহাস সবিস্তারে এই অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। বিশেষভাবে বরাক উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত আখড়ার ঐতিহাসিক-সামাজিক ও ধর্মীয় দিক্‌টি তোলে ধরলাম।

তৃতীয় অধ্যায়ে বরাক উপত্যকায় জনজীবনে আখড়ার প্রভাব, গুরুত্ব ও ভূমিকার কথা, বরাক উপত্যকায় আখড়া ও বৈষ্ণবকে কেন্দ্র করে সংগঠিত সাহিত্য-সংস্কৃতি-উৎসব-মেলার কথা; বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশে আখড়া নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে কি কি অসুবিধের সম্মুখীন এবং এই অসুবিধা বা সমস্যা সমাধানের উপায় সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এক সময়ে বরাক উপত্যকার সমাজ ব্যবস্থায় আখড়ায় গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কিন্তু কালের প্রবাহে সেই গুরুত্ব আজ আর নেই বললেই চলে। তবে এই গুরুত্ব হারানোর মূলে যেমন রয়েছে আধুনিক জীবনযাত্রা তেমনি রয়েছে কিছু সংখ্যক বৈষ্ণব কিংবা বাবাজির কার্যকলাপ। যাই হোক, এসব সমস্যা থেকে বের হওয়ার রাস্তা নিয়ে এ অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনার প্রচেষ্টা করেছি।

এবার আখড়ার উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রকর্ষ, মঠ-মন্দিরের উৎপত্তি ও বিকাশ; আখড়া ও মন্দিরের মিল ও পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা যাক।

প্রথম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে আমরা আখড়ার উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রকর্ষ; ভারতীয় সনাতন মঠ-মন্দিরের উৎপত্তি ও বিকাশ; আখড়া ও মঠ-মন্দিরের মধ্যে মিল ও পার্থক্য; বৈষ্ণবদের শ্রেণিবিভাগ, তাঁদের জীবনযাত্রা এবং ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান— এই অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করব।

বৈষ্ণবধর্ম কোন সময়ে আরম্ভ হয়েছে তার কোনো সঠিক তথ্য নেই। পৃথিবীর সৃষ্টির সময় থেকেই বিশেষ করে হিন্দুধর্মমতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব— এই তিনজন দেবতা হলেন সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও সংহারকর্তা। সহজ ভাবে বলা যায়, এরাই পৃথিবীর সর্বেসর্বা। আমরা সাধারণত জানি, যারা বিষ্ণুর উপাসক তাঁরাই বৈষ্ণব। আর এজন্যেই বলা হয়, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার অনেক আগে থেকেই বৈষ্ণব মতবাদ আমাদের সমাজে প্রচলিত। বিশেষকরে বলা যায়, বৈষ্ণব মতবাদ, বৈষ্ণব সাধনা তথা বৈষ্ণব দর্শন মহাপ্রভুর পৃথিবীতে আগমনের অনেক পূর্ব থেকে প্রচলিত।

ভারতীয় ভক্তিবাদে বৈষ্ণব ধর্মসাধনা একটি বৃহৎ প্রবাহ। এই প্রবাহে কত নদ-নদীর স্রোত একত্রিত হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এ জন্যেই বৈষ্ণবধর্মে রয়েছে অনেক পথ কিংবা মতবাদ। যাই হোক, চৈতন্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণবধর্মকে তাত্ত্বিকেরা চার শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এই চারটি শ্রেণি হল—

(১) শ্রী (রামানুজ)।

(২) সনক (নিম্বার্ক)।

(৩) ব্রহ্ম (মধ্বাচার্য)।

(৪) রুদ্র (বিষ্ণুস্বামী)।

এই চার শ্রেণির বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছাড়া আরও অনেক বৈষ্ণব সম্প্রদায় রয়েছে— যেগুলি চৈতন্যদেব সমকালীন বা তাঁর পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট। এই সম্প্রদায় গুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল— গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, জাতবৈষ্ণব, সহজিয়া, ন্যাড়ান্যাড়ী, ভেকধারী ও গৃহী বৈষ্ণব ইত্যাদি।

আমাদের আলোচ্য বিষয় চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম ও আখড়া। প্রথমেই আমাদের জানা দরকার বৈষ্ণব কে? একজন ব্যক্তি কখন বৈষ্ণব হতে পারে? সাধারণভাবে বলা যায়, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সত্য, দয়া, ক্ষমা, ব্রহ্মচর্য, স্বাধ্যায়, অপরিগ্রহ ও ইষ্টনিষ্ঠ— এই নয়টি গুণের উপরে বা এই নবগুণ সাধন সহায়ে অর্জন করেই ভাগবতের ভিত্ শক্তপোক্ত করতে হয়। এই শক্তপোক্ত ভিতের প্রথম মাধুর্য হবে গুণাতীত হয়ে দীনতার প্রতিমূর্তিরূপে প্রকাশ। অন্তরের সমস্ত অহংভাবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা রাশি থেকে মুক্ত হতে পারলে তবেই বৈষ্ণব হওয়া যায়। এই বৈষ্ণব বা বৈরাগী শব্দের বৈষ্ণবীয় সংজ্ঞা এভাবে— 'বৈ'- বৈদিক ক্রিয়াহীন; 'রা'- রাধাকৃষ্ণ ভজ চিরদিন; 'গী'- গিরিধারী। অর্থাৎ গোপীর বল্লভ কৃষ্ণ যেজন শ্রীচৈতন্য মন্ত্র গুরুদেব দিলেন যখন, এমনি হবে প্রেতের মুক্তি তার লাগে না শ্রাদ্ধ-তর্পণ।

এই বৈষ্ণব বা বৈরাগী কিংবা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের আরাধ্য দেবতাকে সাধন-ভজন করার জন্য যে নির্দিষ্ট স্থান বা গৃহ থাকে, তাকেই সাধারণত 'আখড়া' বলা হয়। আখড়ায় মূলত কৃষ্ণ-রাধা-শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিগ্রহ বা মূর্তি থাকে। অন্য কোনো দেবদেবীর স্থান আখড়ায় নেই। আবার আমরা যাকে 'মন্দির' বলে থাকি, বর্তমান সময়ে তার অর্থ একজন ভক্ত নিজ আরাধ্য দেবদেবীর সাধন-ভজনের জন্য যে স্থান বা গৃহ নির্ধারিত থাকে, তাকেই মন্দির বলা হয়। তবে মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প নানা ধরনের হতে পারে। আখড়া সাধারণত চারচালা, ছয়চালা কিংবা আটচালা বিশিষ্ট ঘর। কিন্তু বর্তমান সময়ে নানাধরনের স্থাপত্যশিল্পের আখড়া দেখা যায়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সবকিছুরও পরিবর্তন ঘটে।

আখড়া ও মন্দিরের মধ্যে এমন কোনো পার্থক্য নেই। যা পার্থক্য রয়েছে তা অতি সূক্ষ্ম। আখড়ায় শুধু বৈরাগী কিংবা বৈষ্ণবভক্ত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি কিংবা গৌরাঙ্গদেবের আরাধনা ও সাধন-ভজন করেন। কিন্তু মন্দিরের মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর সাধন-ভজনের সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। তবে আখড়ায় বৈদিক ক্রিয়াকর্মের কোনো স্থান নেই।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব একসময় শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত মায়াবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে অনেকেই মতপ্রকাশ করেন। কিন্তু এই মন্তব্য সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে বলা যায়, তিনি ধীরে ধীরে সেই মায়াবাদ থেকে সরে এসেছেন। আর তার প্রমাণ পাওয়া যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের এক জায়গায়। তিনি লিখেছেন— "... মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী। / ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি।।" (চৈতন্যচরিতামৃত, পৃঃ ২৮৩)

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব একসময় মায়াবাদের প্রতি আসক্ত থাকলেও ধীরে ধীরে তিনি মায়াবাদ থেকে বের হয়ে এক উদার বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। যেখানে কোনো জাতপাত কিংবা সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। মানুষের প্রতি মমত্ববোধই মহাপ্রভুর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। মানুষকে এবং পৃথিবীকে নিতান্তই 'মায়া' ভাবা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মহাপ্রভু বৈষ্ণব বা বৈরাগীর কর্মপথ এভাবে ঠিক করে দিয়েছিলেন—

"বৈরাগীর কৃত্য সদা নামসংকীর্তন।
শাকপত্র ফলমূলে উদরভরণ।।
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।" (চৈতন্য ভাগবত, পৃঃ ৭৩৯)

চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্বাচার্যের সঙ্গে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের একটু মিল রয়েছে। তবে এই মিলের চেয়ে অমিলের পরিসর বেশি। মধ্বাচার্য যেখানে বলেছেন 'কর্ম ও কর্মান্তে ক্রম মুক্তি'। সেখানে মহাপ্রভু বলেছেন 'কর্মমুক্তি দুই বস্তু ত্যাজে ভক্তগণ।' অর্থাৎ সাধনতত্ত্বগতভাবে ও মতাদর্শগতভেদ স্পষ্ট।

মধ্বাচার্যের মত হল ভেদবাদী কিংবা দ্বৈতবাদী। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথ হল অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। আর রামানুচার্যের মত হল বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী। এই তিন আচার্যের মতের মধ্যে বৈদান্তিক মতের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

মহাপ্রভুর নির্দেশিত পথে 'সেব্য-সেবক' ভাব। অর্থাৎ অনর্পিত মাধুর্য রসতত্ত্বের প্রধানতম অঙ্গমঞ্জরীভাব অবলম্বন করে অন্তশ্চিন্তিত গোপীদেহ লাভ করে উক্ত দেহের উৎকর্ষ সাধন এবং মানস ভজনাঙ্গে কুঞ্জনাগে। শ্রীমতি রাধিকার প্রিয় সখিরা তথা যে আটজন নায়িকা রয়েছে তাদের মধ্যে যেকোনো এক সখির অনুগা হয়ে রাধার সেবা। আর এখানেই চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষত্ব। তত্ত্বগত বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মধ্বাচার্যের রীতি-নিয়মে এসব বিষয় নেই। তাঁর তত্ত্বে, অপূর্ব সাধনতত্ত্ব, প্রেমরসতত্ত্ব, সেবাতত্ত্ব, নির্গুণ বা শ্রদ্ধাভক্তিতত্ত্ব অনুপস্থিত। এ ছাড়া মধ্বাচার্যের আরও কিছু মন্তব্য চৈতন্যদেবের ভক্তিশাস্ত্রবিরোধী এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

এরফলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় কি মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। কিন্তু

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা নিজেদেরকে মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচয় দেন। আর এই পরিচয়ের অন্দরে রয়েছে অনেক লুকানো কথা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় চৈতন্যদেব প্রবর্তিত সাধ্যসাধনতত্ত্ব থেকে আলাদা থাকলেও গুরু পরম্পরায় সূত্রবদ্ধ। লৌকিক লীলায় মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু বিশিষ্ট সাধক ঈশ্বরপুরী, তাঁর গুরুদেব মাধবেন্দ্র পুরী এবং তৎপূর্ববর্তী গুরু পরম্পরায় রয়েছেন শ্রীশ্রীমধ্বাচার্য। এদিক দিয়ে বিচার করলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্বাচার্য নামে পরিচিত।

যাই হোক, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মকে সাধারণত চার শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এই চারটি শ্রেণি হল—

(ক) যাঁরা বিষ্ণুর উপাসনা করেন, তাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গের কোনো মতামত গ্রহণ করেন না।

(খ) যাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবকে নিরুক্তমতে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে থাকেন।

(গ) যাঁরা মহাপ্রভুকেই উপাস্য জ্ঞানে পুজো করে থাকেন।

(ঘ) যাঁরা নামে বৈষ্ণব হলেও আচার-ব্যবহারে একেবারে ভিন্ন পথের পথিক।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সময়কাল থেকেই বৈষ্ণবধর্মের বিবর্তন ঘটতে শুরু হয়। বিশেষ ভাবে সৃষ্টি হয় নানাসম্প্রদায় কিংবা উপসম্প্রদায়। এই উপসম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল— গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, সহজিয়া, জাতবৈষ্ণব, আউল, বাউল, কর্তাভজা, ন্যাড়ান্যাড়ি, দরবেশ, সাঁই, সখিভাবনা, চূড়াধারী ও গৌরাঙ্গ নাগরী ইত্যাদি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ঃ এই সম্প্রদায়ের মতে মহান্ত ও গুরুরা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরাই ধর্ম প্রচারক। তাঁদের ধর্মমতে আটজন প্রধান মহন্ত চৌষট্টিজন মহান্তের পরিচালক ছিলেন। প্রধান মহান্তেরা হলেন— স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, গোবিন্দ দাস ঠাকুর, রামানন্দ ঘোষ ইত্যাদি। এই মহান পরম শ্রেষ্ঠ মহান্তদের এবং তাঁদের চৌষট্টি পার্ষদের পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নামে ভোগ দেওয়ার রয়েছে নির্দিষ্ট নীতিনিয়ম। তাঁদের মধ্যে জাতবিচার ছিল না। বলা হয়েছে—

"শ্রীকৃষ্ণ ভজনে হয়ে সবে অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী।।
শূদ্র নহে কৃষ্ণের ভজন যেই করে।

সেইজন ভাগবত জানিহ সংসারে।।" (শ্রীহরিভক্তিতত্ত্বসার, পৃঃ ৫৫৬)

কৃষ্ণের ভজন যে করে, তার জাতির বিচার না-করা হলেও, বলা হয়েছে যে বৈষ্ণব গুরুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ গুরুই শ্রেষ্ঠ। বলা হয়েছে—

"মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সুব্রাহ্মণ।

সকল বর্ণের গুরু বেদের লিখন।।

.....

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গুরু করিবে নিশ্চিত।।"

(রামচন্দ্র গোস্বামী- পাষণ্ড দলন, শ্রীশ্রীবৃহৎভক্তিসারতত্ত্ব, পৃঃ ৫৫৪)

যাই হোক, দীর্ঘসময় ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব কিংবা ব্রাহ্মণ বংশীয় বৈষ্ণব ও অব্রাহ্মণ বংশীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে নানাটানাপোড়েন দেখা দিলেও একসময় ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই টানাপোড়েনের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম অনেক মাত্রা নিয়ে এক নব ব্রাহ্মণ্য মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সৃষ্টি হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ। গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণবদের উচ্চ-নীচ শ্রেণিবিভাগ করেছেন এভাবে—

(১) গৌড়ীয় বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গুরু।

(২) অন্যান্য উচ্চ জাতীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব গৃহস্থ।

(৩) জাতবৈষ্ণব।

মূলত দত্ত মহাশয়ের দৌলতে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থা যেন পুনরুজ্জীবন লাভ করে। মহাপ্রভুর প্রদর্শিত বৈষ্ণব ধর্মের ঠিক উল্টোপথে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এগুতে থাকে।

জাতবৈষ্ণব ঃ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের উদার সর্বজনীন প্রেমধর্মের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে যেসব ব্যক্তি বা সমাজভুক্ত লোক তাঁদের পূর্বসমাজ ত্যাগ করে ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হয়েছিলেন তারাই হল জাতবৈষ্ণব। নানাশ্রেণির, নানাবর্ণের মানুষ জাতবৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হলেও বেশির ভাগ অব্রাহ্মণ কিংবা বলা যায় শূদ্র বর্ণের মানুষেরাই জাতবৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। এর মূল কারণ বর্ণবাদী সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরাই সমাজের

দণ্ডমুণ্ডকর্তা এবং অব্রাহ্মণরাই যেন তাদের অধীনস্ত ভৃত্যস্বরূপ ছিল। সেই সময়ে অব্রাহ্মণরা সামাজিক অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দলে দলে অন্য ধর্মে বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের ছাতার নীচে আশ্রয় নেয়। কিন্তু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর এসব অত্যাচারিত অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোকেরা এক বিকল্প ছাতার সন্ধান পেয়ে যান। মহাপ্রভুও ওইসব লোকদেরকে অতিসাদরে কৃষ্ণনাম বিতরণ করে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন।

কিন্তু এই জাতবৈষ্ণব সমাজে বিপত্তি দেখা দেয় মহাপ্রভুর ইহলোক ত্যাগ করার পর থেকেই। বৈষ্ণব সমাজে এই জাতবৈষ্ণবেরা হয়ে গেলেন অপাঙক্তেয়। সমাজের উচ্চস্তর থেকে আগত বৈষ্ণবেরা নিজেদেরকে বৈষ্ণব গুরুরূপে সবার সামনে তোলে ধরেন। আর তখন থেকেই জাতবৈষ্ণবদেরকে তারা হরিজন বৈষ্ণব বলে উপহাস করে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে জাত বৈষ্ণবেরা চরম বিপাকে পড়ে। তাঁরা যেন দুইকূল হারিয়ে বসেন।

জাতবৈষ্ণবদের কোনো গোত্র থাকে না। কিন্তু তাঁদের রয়েছে পনেরোটি পরিবার। এই পরিবারগুলির হল— অদ্বৈত পরিবার, নিত্যানন্দ পরিবার, শ্যামানন্দ পরিবার, জগদীশ পণ্ডিত পরিবার ইত্যাদি।

জাতবৈষ্ণবদের দীক্ষা দেওয়ার নিয়ম ঃ জাতবৈষ্ণবদের দীক্ষার প্রকরণ খুবই সরল। গুরু বা বৈষ্ণব শিষ্যের কানে একাক্ষরী মন্ত্র দেন। সেইসঙ্গে শিষ্যের হাতে তোলে দেন ডোরী, কৌপিন ও বহির্বাস। এ ছাড়াও গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় তুলসীর মালা, হাতে তোলে দেওয়া হয় কড়ঙ্গ বা নারকেলের খোলা।

জাতবৈষ্ণবদের বৈশিষ্ট্য—

(১) জাতবৈষ্ণবেরা সমাজে বিশেষকরে উচ্চবর্ণের কাছে যেন অপাঙক্তেয় বা অস্পৃশ্য।

(২) জাতবৈষ্ণবেরা ব্রাহ্মণ্য আচার-আচরণকে উপেক্ষা করে।

(৩) ওদের মালা-চন্দনে বিয়ে অনুষ্ঠান সারা হয়।

(৪) জাতবৈষ্ণবেরা বাল্য বিবাহের পক্ষপাতী।

(৫) তাঁরা বিবাহ-বহির্ভূত শারীরিক মিলনে অভ্যস্থ। তাই এই সমাজে অবৈধ সন্তানের সংখ্যা বেশি। সেইসঙ্গে ওরা ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

জাতবৈষ্ণবদের বিয়ে ব্যবস্থায় দেখা যায়, গুরু-গোঁসাইরা মহাপ্রভুর মূর্তিতে সচন্দন ফুল দিয়ে পুজো করে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে 'মালসাভোগ' দেওয়া হয়। মালসাভোগ হল, অন্ন,

ফল এবং অন্যান্য খাদ্যভোগ। এসব আচার-আচরণের সঙ্গে কীর্তন গাওয়া হয়। কন্যাদান করেন কন্যার অভিভাবক। বিশেষ করে বরকনের কণ্ঠীবদল করে বিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এখানে উল্লেখনীয়, এই বৈষ্ণব সমাজে বিধবা বিয়ের প্রচলন রয়েছে। তবে বিধবা বিয়ের ক্ষেত্রে কন্যাদান হয় না।

সহজিয়া বৈষ্ণব ঃ বাংলার বৈষ্ণব-সহজিয়াধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ সহজিয়া মতে এক বিশেষ রূপান্তর। মূল বৈষ্ণবধর্মে পরকীয়া প্রেমতত্ত্ব শুধুমাত্র দার্শনিক তত্ত্বেই স্বীকৃত। কিন্তু বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মে তা সাধনার কার্যকরী ক্ষেত্রেও গৃহীত হয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের ভিত্তি বৌদ্ধধর্ম, বেদান্ত, তন্ত্র ও যোগের উপর, আর বৈষ্ণব সহজিয়া মতের ভিত্তি তন্ত্র, যোগ ও প্রেমের আদর্শে স্থাপিত হয়েছে। এই দেহভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড নিহিত— তন্ত্র ও যোগের এই তত্ত্বকেই বৈষ্ণব সহজিয়ারা আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা মানুষকেই শ্রেষ্ঠ জীব বলে স্বীকার করেন। বৌদ্ধ সহজিয়াদের গুরুবাদ, গুহ্যসাধনা, উল্টারীতির ব্যবহার বৈষ্ণব সহজিয়ারা গ্রহণ করলেও কিছু ক্ষেত্রে তাদের মত পৃথক। যেমন বলা যায়, বৌদ্ধ সহজিয়া মতের লক্ষ্য সহজরূপ মহাসুখ, কিন্তু বৈষ্ণব সহজিয়া মতের লক্ষ্য সহজরূপ প্রেম। এই পরমপ্রেম পুরো সৃষ্টি প্রবাহের গুহাহিত সনাতন তত্ত্ব।

যাই হোক, বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বের আদিস্থল বৌদ্ধ সহজিয়ারা। পরবর্তী সময়ে এই বৌদ্ধ সহজিয়ারা নানা-শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যেমন— খুসি-বিশ্বাসী, রাম-বল্লভী, সাহেবধনী, দরবেশি, সহজিয়া, কর্তাভজা, বলরামী, হজরতী, গোবরাই, পাগলানাথী, পাঁচফকিরি ইত্যাদি। তাঁরা হিন্দুধর্মের মূল সংস্কারগুলির মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্য নীচে তোলে ধরা হল—

(১) সহজিয়া বৈষ্ণবেরা স্বাধীনভাবে চৈতন্যের, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের, কৃষ্ণদাস কবিরাজের, নরোত্তম দাসের নাম ব্যবহার করে ধর্মপ্রচার করেন।

(২) কালক্রমে সহজিয়া বৈষ্ণবের সাধনসঙ্গিনীও তান্ত্রিক ভৈরবী চক্রে যোগদান করতে থাকেন। ভক্তির সঙ্গে আদিরসের মিশ্রণে বৈষ্ণবধর্মের কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয়।

(৩) সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে জাতিবিদ্বেষ নেই কিংবা জাতপাতে বিশ্বাস করেন না।

(৪) সহজিয়া বৈষ্ণবেরা প্রান্তিকায়িত মানুষদেরকে দীক্ষা দিতেন বা দেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব মূল্যবোধকে মূল্য দিতেন না।

ন্যাড়ান্যাড়ী সম্প্রদায় ঃ রাঢ় অঞ্চলে নাড় পণ্ডিত নামে একজন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন। তিনি ছিলেন সহজিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবর্তক। খুব সম্ভব এই নাড় পণ্ডিতের সমর্থক বা সম্প্রদায়ভুক্ত লোককে 'ন্যাড়ান্যাড়ী' বলা হত। যাই হোক, এই ন্যাড়ান্যাড়ীরা একসময় নানাধরনের ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে বীরচন্দ্র প্রভু এই বৌদ্ধ ন্যাড়ান্যাড়ীদেরকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে সৎপথে ফিরিয়ে এনেছিলেন। ফলে তারা কমবেশি ব্যভিচারমুক্ত হয়। এই ন্যাড়ান্যাড়ী সম্প্রদায় বর্তমানেও আছে; বিলুপ্ত হয়নি। বিভিন্ন কারণে যাদের স্থানচ্যুত হয়, তারাই ন্যাড়ান্যাড়ি সম্প্রদায়ে আশ্রয় নিয়ে এক ভদ্র জীবনযাপন করার সুযোগ পায়। এই ন্যাড়ান্যাড়ি সম্প্রদায় সহজিয়া বৈষ্ণব হিসেবে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের চারটি উপবিভাগ রয়েছে। এই উপবিভাগগুলি হল— আউল, বাউল, সাঁই ও দরবেশ।

গৃহী ও ভেকধারী বৈষ্ণব ঃ চৈতন্য পরবর্তী সময়ে বাংলার বেশির ভাগ বৈষ্ণবদের কাছে এমনকী বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে চৈতন্যদেব যেন শ্রীকৃষ্ণের অবতারস্বরূপ। তাই বর্তমানে বেশির ভাগ বৈষ্ণব ভক্ত চৈতন্যদেবকে অবতার জ্ঞানে পুজো করে থাকেন। আবার তারা শুধু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অবতার রূপে জ্ঞান করেননি; সঙ্গে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যকে অবতাররূপে জ্ঞান করেছেন। এসব বৈষ্ণব বা ভক্তদের কাছে নিত্যানন্দ হলেন বলরাম ও অদ্বৈত আচার্য সাক্ষাৎ সদাশিব। যাই হোক, এই শ্রেণির বৈষ্ণবদের কাছে ভক্তি ও প্রেমই সর্বস্ব। তাদের মতে জীবমাত্রে ওই প্রেম ভক্তির অনুষ্ঠানের অধিকারী। নামসংকীর্তন এই মতাবলম্বীর প্রধান সাধন। তবে সবসাধনাতেই তারা গুরুর প্রয়োজন স্বীকার করে। ভেকধারী বৈষ্ণবেরা গৃহী বৈষ্ণবদের মন্ত্রদান করে, কখনও শিষ্যদের কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করে, আবার কখনও চৈতন্যমন্ত্রও দান করেন। এসব বৈষ্ণবেরা ঘরে বসবাস করে ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করেন। যাদেরকে বলা হয় গৃহী বৈষ্ণব।

আবার যারা বৈরাগ্য অবলম্বনে জাতি, কূল, মান পরিত্যাগ করে এই ধর্ম অবলম্বন করতে চান তাদেরকে ভেক নিতে হয়। আর যারা 'ভেক' নিয়ে বৈষ্ণবধর্ম পালন করেন, তাদেরকে ভেকধারী বৈষ্ণব বলা হয়। যাই হোক, বর্তমান সময়ে এই ভেকধারী বৈষ্ণবরা বিয়ে করতে পারে। বিয়ের সময় বরকনে কণ্ঠিবদল করে কিংবা স্বয়ং দক্ষিণা ও গোস্বামীর নিমিত্ত ন্যূনতম পাঁচসিকা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে মহাপ্রভুর ভোগ ও মহোৎসবও হয়ে থাকে। এই ভেকধারী বৈষ্ণব সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন রয়েছে। তবে এই ধরনের বিয়েতে স্ত্রী সিঁদূর পরতে পারেন না। বিশেষত তাকে ভেকধারী বৈষ্ণবী সেজে থাকতে হয়। অন্যদিকে গৃহী বৈষ্ণব সমাজে বিধবা বিয়ের রীতি প্রচলিত নয়।

জাতবৈষ্ণবদের সঙ্গে বৈরাগী-বোষ্টমদের পার্থক্য ঃ

(১) জাতবৈষ্ণবেরা হলেন গৃহস্থ বৈষ্ণব এবং বৈরাগীরা উদাসী, ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করেন।

(২) সহজিয়া, উদাসী বৈষ্ণবেরা গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা, কৃষ্ণনাম গান করেন, গাছের তলায় বসে ভিক্ষা করেন। অনেকেই গাঁজাও টানেন। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হন বলে সমাজে প্রচলিত ধারণা রয়েছে।

(৩) বঙ্গভূমের অনেক জায়গায় 'বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের' নিয়ে প্রেমমেলা বসত। সেখানে ফৌজদারকে কিছু পয়সা দিয়ে বৈষ্ণবেরা তাদের নতুন বৈষ্ণবী লাভ করতেন। প্রেমতলায় যেসব বাবাজি তাদের বৈরাগিনী মাইজি পরিবর্তন করতেন তাদের 'আখড়া' থাকত। বরাক উপত্যকায় পরোক্ষ ভাবে এই প্রথা বর্তমানেও প্রচলিত।

(৪) ব্রাহ্মণ ও উচ্চশূদ্ররা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণ করেন। আর সমাজে যারা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ তারাই বোষ্টম-বৈরাগী হতেন।

(৫) অনেক ব্রাহ্মণ পদবীধারী ব্যক্তি ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় 'জাতবৈষ্ণব' হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ ও উচ্চশূদ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রেমধর্ম প্রচার পছন্দ করেননি। তবে জাতবৈষ্ণবদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ক্ষমতাও ছিল না তাদের।

যাই হোক, পরবর্তী অধ্যায়ে বরাক উপত্যকার আখড়ার ইতিহাস নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বরাক উপত্যকা বলতে বোঝানো হয়েছে কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা। এই তিন জেলা নিয়ে গঠিত বরাক উপত্যকা। কয়েক বৎসর পূর্বে করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি ছিল কাছাড় জেলার অন্তর্গত দুটি মহকুমা। স্বাধীনতার পূর্বে করিমগঞ্জ মহকুমা ছিল সিলেট বা শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত। এখানে উল্লেখনীয়, কাছাড়ি বা ডিমাসারা সমতল বরাক উপত্যকায় আসার পূর্বে এই অঞ্চল শ্রীহট্ট এবং ত্রিপুরা রাজার অধীনে ছিল।

কাছাড় জেলার প্রাচীন ইতিহাসের লিখিত রূপ নেই। এমনকি কাছাড় নামে কোনও রাজ্য ছিল না। আনুমানিক ৩০০-৩৫০ বৎসর পূর্বে সমতল কাছাড় রাজ্যের সৃষ্টি হয়। পাহাড়ি মাইবং বা আশপাশ অঞ্চল নিয়ে হয়তো হৈড়ম্ব নামে একটি রাজ্য ছিল। যাই হোক, কাছাড় জেলা সম্পর্কে বিশিষ্ট পণ্ডিত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বলেছেন—

> "কাছাড় জিলার বর্ত্তমান সীমাও অল্পকাল যাবৎ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কাছাড়ের সমতল ভাগ ত্রিপুরা রাজ্যের এবং উত্তর-কাছাড় কামরূপ ও পরে কাছাড়ী রাজগণের অধিকারভুক্ত হয়। দুই রাজ্যের দুই অংশ লইয়া এই জিলা গঠিত। ভৌগোলিক হিসাবেও উত্তর-কাছাড় আসামের পর্ব্বতশ্রেণীর এবং হাইলাকান্দি ও শিলচর মহকুমাদ্বয় সুরমা উপত্যকার পূর্ব্বাংশ।"[১]

এই নবগঠিত কাছাড় জেলার পরিসীমা বি. সি. অ্যালেন এভাবে দিয়েছেন—

> "...The district consists of two distinct portions the hills, which from the eastern extremity of the Surma valley... the North Cachar sub-division, which covers an area of 1,651 square miles, is hilly country. The area of the two remaining subdivisions of Silchar and Hailakandi, which is generally classes as plain, is 1,918 square miles."[২]

এই পরিসীমা ছিল ব্রিটিশ শাসনকালে। স্বাধীনতার পরে কাছাড়ের পরিসীমার পরিবর্তন ঘটিছে।

প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগে শ্রীহট্ট ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৭৬৫ খ্রিঃ ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী শ্রীহট্টকে তাদের অধীনস্থ

করে। তখন থেকে শুরু হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন। অন্যদিকে ঘটোৎকচের বংশধর ডিমাসা সম্প্রদায় নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ডিমাসাভূমি নিজেদের অধিকারে রেখেছিল। কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণে ডিমাসারাজ পর্যুদস্ত হয়ে সমতলভূমি খাসপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই ডিমাসা বা কাছাড়ি জনজাতির নামেই সমতল ভূমির নাম হয় কাছাড়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই কাছাড় একসময়ে শ্রীহট্ট এবং ত্রিপুরার অধীনে ছিল। প্রাবন্ধিক শিবতপন বসু কাছাড়ি রাজাদের উত্থানপতনের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন—

> "বোড়ো-কাছাড়িদের আর একটি শাখা ডিমাসা। সুবর্ণশ্রীতে এঁরা ডিমাপুর নগর পত্তন করেন। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ— মোটামুটি চারশো বছর এঁদের রাজত্বকাল। চুকাফার নেতৃত্বে বা ১৫৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ডিমাসাদের পরাজয় ঘটলে এবং ডিমাপুর ধ্বংস হলে তারা মাহুর নদীর তীরবর্তী মাইবং-এ নতুন রাজধানী স্থাপন করেও আহোমদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না। ১৭০৭ সালে তারা খাসপুর বা খুসপুর অঞ্চলে (শিলচরের অদূরে) নতুন রাজপাট স্থাপন করেন।"[৩]

কিন্তু এই নতুন রাজপাটও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ, মণিপুরি সৈন্য খাসপুর আক্রমণে উদ্যত হলে কাছাড়ি রাজা গোবিন্দনারায়ণ বর্মণ (১৮১৩-১৮৩০) ভয় পেয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আশ্রয় নেন। শেষপর্যন্ত ১৮২৪ খ্রিঃ ৬ই মার্চ উভয়পক্ষে এক সন্ধি স্থাপন করে। সন্ধি অনুসারে গোবিন্দনারায়ণ নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করলেও স্বাধীন রাজা থাকেননি। ব্রিটিশ সরকারের হাতের পুতুল হিসেবে রাজপাট চালিয়ে যান। তবে রাজধানী খাসপুরে আর কোনোদিন পা মাড়াননি। কাটিগড়ার হরিটিকর নামক স্থানে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।

কিন্তু রাজা গোবিন্দনারায়ণের ভাগ্য ছিল অস্তাচলগামী। মণিপুরি সৈন্য অশ্ব বিক্রেতার ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজার অন্দরমহলে প্রবেশ করে। ছদ্মবেশী সৈন্যরা রাজা গোবিন্দনারায়ণকে বর্শাবিদ্ধ করে হত্যা করে। শুধু হত্যা নয়, রাজার দেহ থেকে মুণ্ডকে আলাদা করে একটি পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যায়। সেইসঙ্গে রাজধানীতে আগুন লাগিয়ে সব ছারখার করে দেয়। ১৮৩০ খ্রিঃ গোবিন্দনারায়ণের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাছাড়ি রাজত্বের অবসান ঘটে। রাজার মৃত্যুর পর ইংরেজরা কাছাড়ের শাসনভার নিজেদের হাতে নিতে বাধ্য হয়। বিশেষত ১৮৩২ খ্রিঃ ১৪ আগষ্ট পাকাপাকিভাবে ইংরেজরা কাছাড়ের শাসনভার গ্রহণ করে।

যে নদীকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছে বরাক উপত্যকা সেই 'বরবক্র' নদীর কথা বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে উল্লেখিত। বায়ুপুরাণে এভাবে লিখিত—

"বিন্দ্যপাদ সমুদ্ভূতো বরবক্র সুপন্যদ।

যত স্নাতা জলং পিত্বা নবঃ সদগতিমাপ্লুয়াৎ।।"[৪]

বরাহপুরাণের মধ্যে বরবক্র নদীর কথা এভাবে রয়েছে—

"যস্যৈবং নদরাজস্ব বক্রে বক্রে চ পুণ্যদং।

তীর্থং প্রশস্তং বিখ্যাতং বরবক্রং ততঃ স্মৃতম্।।"[৫]

বরাক নদী তীরবর্তী সিদ্ধেশ্বর কপিল মুনির আশ্রম অবস্থিত। এই আশ্রম সম্বন্ধে 'বরাহপুরাণে' লিখিত একটি শ্লোক—

"যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলো মুনিঃ।

যত্র কাপালিকং তীর্থং শুভং সিদ্ধেশ্বরো হরঃ।।"[৬]

শাস্ত্রে কথিত রয়েছে শিববাড়ি ঘাটে নদীর জলে স্নান করলে সর্বপাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

অবিভক্ত কাছাড়ের অনেক উপনদী বরাক নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। জিরি, চিরি, সোনাই, ঘাগরা, রুকনি, মধুরা, বাদরি, ধলেশ্বরী, কাটাখাল ছাড়াও অনেক নদী বরাকে আত্মসমর্পণ করেছে। এই বরাক নদী মণিপুর পাহাড়ের মাওথানা নামক স্থান থেকে উৎপত্তি হয়েছে। উৎপত্তিস্থল থেকে এঁকেবেঁকে ধীরে ধীরে নেমে এসে মালুয়া ও ভাঙ্গার মধ্যবর্তী হরিটিকর নামক স্থানে বরাক নদী দুটি শাখয় বিভক্ত হয়। শাখা দুটি হল— সুরমা ও কুশিয়ারা নদী। সুরমা নদী অতিবাহিত হয়েছে উত্তর দিকে এবং কুশিয়ারা নদী দক্ষিণ দিকে অতিবাহিত হয়েছে। এই দুটি নদী ভারত ও বাংলাদেশের সীমানা চিহ্নিত করে একসময়ে পুরোপুরি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে ভৈরব বাজারের কাছে ব্রহ্মপুত্রে যুক্ত হয়ে মেঘনায় মিলিত হয়েছে।

বরাক উপত্যকার তিন দিকে রয়েছে পার্বত্যভূমি। এই পার্বত্যভূমি থেকে ধীরে ধীরে মাটি নেমে সমতলভূমির সৃষ্টি করেছে। আবার বিভিন্ন উপনদী ও মূল বরাক নদীর পলিমাটি সৃষ্টি করেছে বড় বড় চর তথা সমতলভূমি। এই সমতল ভূমিতে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন গ্রাম। বরাক উপত্যকায় সাধারণত বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয় মে-জুন মাসে এবং শেষ হয় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। বৎসরে মোটামুটি গড়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হল ১৮০০ মিলিমিটার। নানা প্রাকৃতিক কারণে জনসাধারণকে কমবেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এখানকার গড় তাপমাত্রা নিম্নে ১০-১১ সেন্টিগ্রেট এবং ঊর্ধ্বে ৩৫-৩৬ সেন্টিগ্রেট থাকে। বরাক উপত্যকায়

বিভিন্ন শ্রেণির জমি রয়েছে। চাষযোগ্য জমি বৎসরে একবার বা দুইবার কৃষিকাজে (ধান উৎপাদনে) ব্যবহৃত হয়। কৃষিজমি প্রতি বৎসর কমবেশি বন্যায় আক্রান্ত হয়। ফলস্বরূপ, কৃষিজমি যেমন উর্বর হয়ে ওঠে তেমনি প্রচুর মাছের উৎপাদন হয়। কিন্তু শাকসবজি চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন হয় না। আসামের বিভিন্ন জেলা কিংবা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে শাকসবজি আমদানি করা হয়। এ ছাড়া এখানকার মানুষের প্রিয় খাদ্য শুঁটকি মাছ।

বরাক উপত্যকা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজাদের অধীন ছিল। তবে বেশির ভাগ সময়ই বঙ্গভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই বরাক উপত্যকায় বসবাসকারী জনগণ অস্ট্রোলয়েড, দ্রাবিড়, নর্ডিক ও অ্যালপো-দিনারীয় জাতির রক্তের মিশ্রণে জাত। মুসলিম যুগের পূর্বে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে বঙ্গ, পুণ্ড্র, বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি জনপদের নাম পাওয়া যায়। আর্যদের আগমনের পূর্বে এইসব জনপদ গড়ে ওঠে। সেই সময়ে বিশেষত অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করত। তারা ছিল কৃষি ও শিকারজীবী। এদের মধ্যে অনেকেই গৃহ ও অরণ্যচারী অসংখ্য কোমে বিভক্ত ছিল। এইসব বিচিত্র কোমের ভিতর বিয়ে কিংবা বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণগত বিধিনিষেধও ছিল। আবার এইসব অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের সঙ্গে বোড়ো ও মঙ্গোলীয় জাতি এসে যোগদান করে। পরে এঁদের সঙ্গে ধীরে ধীরে আর্য সমাজের মিলন ঘটে। গড়ে ওঠে এক নতুন জাতি। এই নতুন জাতি হল বঙ্গভূমির বাঙালিজাতি। এই বাঙালিরা পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়। বঙ্গভূমির অন্তর্ভুক্ত বরাক উপত্যকা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক মিহির ভট্টাচার্য লিখেছেন—

> "প্রাচীনকালের ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায় যে, দীর্ঘকাল এই অঞ্চল ছিলো বঙ্গভূমির অংশ। পরবর্তীকালে এর কিছু অংশ চলে যায় বাংলার সুলতানী ও মোগল শাসকদের হাতে আর বাকী অংশ ত্রিপুরার রাজবংশ, কোচরাজবংশ ও সর্বশেষ ডিমাসা রাজাদের হাতে। শেষ পর্যায়ে ডিমাসা রাজাদের রাজত্বের একটা অংশের নাম হয়েছিলো কাছাড় জেলা। ওই পূর্বতন কাছাড় জেলার পার্বত্য এলাকা নিয়ে তৈরি হয়েছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা। সমতল অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিলো কাছাড় জেলা। বর্তমানে সেই জেলাও ভাগ করে গঠিত হয়েছিলো কাছাড় জেলা। বর্তমানে সেই জেলাও ভাগ করে গঠিত হয়েছে কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলা। এর সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলা যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে বরাক উপত্যকা। করিমগঞ্জ জেলা আবার দেশভাগপূর্ব শ্রীহট্ট জেলার একটি অংশমাত্র।"[৭]

এখানে উল্লেখ করা যায়, ১৭৬৫ খ্রিঃ ব্রিটিশ সরকার শ্রীহট্ট জেলায় তাঁদের ঔপনিবেশিক শাসন শুরু

করে। অন্যদিকে ১৮৩২ খ্রিঃ ডিমাসাদের রাজ্য কাছাড় জেলাকে তাদের দখলে নিয়ে যায়। সেইসঙ্গে কাছাড়কে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বর্তমান বাংলাদেশ এবং আসামের একবারে দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত বরাক উপত্যকার মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সামাজিক পরিবেশ একই। কিন্তু প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে তৎকালীন বাংলার দুটি জেলা শ্রীহট্ট ও কাছাড়কে আসাম রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন নাম দেওয়া হয় সুরমা উপত্যকা। এখানে উল্লেখনীয়, শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ১৮৭৪ খ্রিঃ ব্রিটিশরা পৃথক আসাম প্রদেশ গঠন করে। এই নতুন প্রদেশের রাজস্ব ঘাটতি মেটানোর জন্যই ব্রিটিশরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই সিদ্ধান্তে নতুন রাজ্য আসাম ও ব্রিটিশদের উপকার হলেও বাঙালিদের জন্য এটি ছিল আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। যার ফল বাঙালিরা আজও উপভোগ করছে।

যাই হোক, সুরমা উপত্যকা গঠনের পর শ্রীহট্ট শহর এই উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে উপস্থিত হয়। এরপর ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির নিত্য-নতুন খেলা। ১৯০৫ খ্রিঃ বঙ্গভূমি দু-ভাগে বিভক্ত হয়। বঙ্গভঙ্গের খেলায় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ পুনর্গঠন করা হয়। কিন্তু ১৯১১ খ্রিঃ বঙ্গভঙ্গ বাতিল হলেও শ্রীহট্ট ও কাছাড় আসামে থেকে যায়। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৪ আগস্ট স্বাধীনতার সময় করিমগঞ্জ (শ্রীহট্ট জেলার অংশ) পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। শুধু অন্তর্ভুক্ত নয়; পাকিস্থানের পতাকা তুলে করিমগঞ্জবাসী জনসাধারণ স্বাধীনতা দিবস পালন করেন। এখানে উল্লেখনীয়, তৎকালীন শ্রীহট্ট জেলার রাতাবাড়ি, পাথারকান্দি, বদরপুর থানা ও করিমগঞ্জ থানার কিছু অংশ কাছাড় জেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়। শ্রীহট্টের বাকি অংশ চলে যায় পূর্বপাকিস্তানে। পরবর্তী সময়ে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিপ্রধান অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। তৎকালীন সময়ে কাছাড় জেলায় ছিল চারটি মহকুমা— শিলচর, হাফলং, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ। ১৯৫৩ খ্রিঃ হাফলং মহকুমাকে মিকির বা কার্বিআংলং পাহাড়ের সঙ্গে যুক্ত করে উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা গঠন করা হয়। এরপর ১৯৮৪ খ্রিঃ করিমগঞ্জ মহকুমা ও ১৯৮৯ খ্রিঃ হাইলাকান্দি মহকুমা জেলা হিসেবে উন্নীত হয়। কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলাকে নিয়ে নামকরণ করা হয়েছে বরাক উপত্যকা।

বরাক উপত্যকা সমতলভাগে অতি প্রাচীনকাল থেকে জনগণ বসবাস করছে। এই অঞ্চল 'পুরাকালে ত্রিপুরা প্রত্যন্তভূমির অন্তর্গত'ছিল। বিশিষ্ট পণ্ডিত নীহাররঞ্জন রায় বরাক উপত্যকাকে পুরাভূমির অংশ বলে মনে করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"চট্টগ্রামের পার্বত্য-চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্বত্য-ত্রিপুরা অঞ্চল, কাছাড় জেলার উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশে হালিয়াকান্দি অঞ্চল এবং শ্রীহট্ট জেলার পূর্বাঞ্চলকে মোটামুটি পুরাভূমির অন্তর্গতই বলিতে হয়। ...এইসব ভূখণ্ড পুরাতন গঠন এবং ইহাদের অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্বাঞ্চলে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।"[৮]

একসময়ে সোনাই অঞ্চলে 'ইসলামপুর মৌজার অন্তর্গত রাজঘাট নামক স্থানে' ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নানা রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক কারণে ত্রিপুরার রাজধানী জয়পুরে (কৈলাশশহর) স্থাপন করা হয়। এর পরবর্তী সময়ে জয়পুর থেকে আগরতলায় রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রাচীনকালে ভুবন থেকে কৈলাশশহর পর্যন্ত ভূভাগে এক বিস্তীর্ণ জনপদ ছিল। কিন্তু রুকনি নদী তীরবর্তী স্থান রাজঘাট থেকে রাজধানী সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণও সেইসব স্থান ত্যাগ করতে থাকেন। এর প্রধান কারণ ছিল অরাজকতা। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোচ সেনাপতি চিলারায়ের সঙ্গে যুদ্ধের পর থেকে কাছাড় জেলায় ত্রিপুরারাজের আধিপত্য বিলীন হয়। ত্রিপুরা রাজত্বের অবসানে কাছাড়ের সমতলভাগ ধীরে ধীরে অরণ্যে পরিবেষ্টিত হয়। জনমানবহীন ভূমিতে পরিণত হওয়ার জন্যে সমতলভাগের এই দশা ঘটে। সেই সময়ে সমতলবাসী কুম্ভকার, বারুই, পাটনী, মালাকার প্রভৃতি কয়েকটি জাতি বসবাস করলেও সংখ্যায় ছিলেন নিতান্তই কম। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য জাতি শ্রীহট্ট, মণিপুর এবং আসাম থেকে এসে বসবাস শুরু করে। এই সময়ে রুকনি নদীতীরে মদনরাজা, পাঁচগ্রামের (ঠাণ্ডাপুরে) পোড়ারাজা— এ-ধরনের কয়েকজন সীমাবদ্ধ সামর্থ্যবান আঞ্চলিক রাজার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রায় জনমানবহীন সমতলভূমিতে ১৭৪৫ খ্রিঃ যুবরাজ লক্ষ্মীচন্দ্র খাসপুরে রাজধানী স্থাপন করার পর থেকে বিভিন্ন জাতি কাছাড়ে বসবাসের জন্য আসতে থাকেন। তবে রাজার আমন্ত্রণে বেশিরভাগ মানুষ এসেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ্য, লক্ষ্মীচন্দ্র খাসপুরে আসার পূর্বেও হিন্দু ও মুসলিম জাতির মানুষ সমতলভূমিতে বসবাস করতেন। যাই হোক, কাছাড়ি রাজত্বে বাঙালির আগমন সম্পর্কে Sir W.W. Hunter লিখেছেন—

"From their arrival at Kashpur the district history of Cachar commences. Numerous colonies of Bengalis, who came up the Barak valley from Sylhet, had mean while planted their first settlements on the northern side of the river, shortly after passing the Sylhet frontier."[৯]

খাসপুরের পরে পার্শ্ববর্তী দুধপাতিল গ্রামে কিছুদিনের জন্য কাছাড়ি রাজা রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তবে এই রাজধানী ছিল সাময়িক সময়ের জন্য। এই সময়ে সমতল কাছাড়ে অসংখ্য বাঙালির আগমনে নতুন নতুন গ্রামের সৃষ্টি হয়।

তবে এই সময়ে সমতল কাছাড়ে বসবাসরত বাঙালি জনসংখ্যার সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের পরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি সমতল কাছাড়ের রাজনৈতিক দায়িত্ব নেওয়ার পরই মাটিকালির পরিমাপ ও জনসংখ্যা সম্পর্কে মোটামুটি এক ধারণা পাওয়া যায়। ১৯০১ খ্রিঃ ভূতাত্ত্বিক বিভাগের জরিপ অনুসারে কাছাড় জেলার জমির পরিমাণ হল ৩,৭৬৯ বর্গমাইল এবং প্রতি বর্গমাইলে ১২১ জন মানুষের বসতি ছিল। ১৯০৪ খ্রিঃ কাছাড়ের ভূমির পরিমাণ পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় ৩,৫৬৪ বর্গমাইল। বর্তমান বরাক উপত্যকার ভূমির পরিমাণ প্রায় সাত হাজার বর্গ কিঃমিঃ। ১৮৫৫ খ্রিঃ খসড়া লোকগণনায় লোকসংখ্যা ছিল ৮৫,০০০। এরপর সরকারি লোকগণনায় দেখা যায় সমতল কাছাড়ে ১৮৭২ খ্রিঃ ২০৫,০২৭ জন, ১৮৮১ খ্রিঃ ২৯৩,৭৩৮ জন, ১৮৯১ খ্রিঃ ৩৬৭,৫৪২ জন, ১৯০১ খ্রিঃ ৪১৪,৭৮১ জন। এরপর দীর্ঘ কয়েক বৎসরের জনসংখ্যার ইতিহাস আমাদের হাতে নেই। ১৯৭১ ইং জনগণনা অনুসারে অবিভক্ত কাছাড় জেলায় মোট জনসংখ্যা ৩৪,২৬,৬৩৬ জন। ১৯৯১ সালের জনগণনায় ২৪,৯১,৪৯৬ জন এবং ২০০১ সালে লোকসংখ্যা ছিল ২৯,৯৫,৭৬৯ জন। বর্তমান জনগণনায় লোকসংখ্যা হয়তো ৩৫-৩৬ লক্ষ হবে। এখন আমরা বরাক উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত আখড়া সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করব।

জেলা ঃ হাইলাকান্দি

১। (ক) আখড়ার নাম ঃ **জগন্নাথ মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ বক্রিহাওর- ১ম খণ্ড (আনোয়ারপার)।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৭২ ইংরেজি।

(ঘ) প্রথম বৈষ্ণব বা স্থাপনকর্তা ঃ নাম জানা যায়নি। প্রথম বৈষ্ণবের পর এই আখড়ায় সেবায়েত হিসেবে ছিলেন কাঞ্চনদাস বৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান বৈষ্ণব ঃ বর্তমানে এই আখড়ায় সেবায়েত হিসেবে কাজ করছেন রত্নাদাস বৈষ্ণবী। তিনি ভেকধারী বৈষ্ণবী এবং পূর্বে যারা সেবাইত বা বৈষ্ণব ছিলেন তারাও ভেকধারী ছিলেন।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ

(১) পৌষ সংক্রান্তির দিন বিকেল বেলায় রথ টানা হয়। আবার ওইদিন বিকেল বেলা থেকে নাম সংকীর্তন আরম্ভ হয়ে মাঘ মাসের দুই তারিখ পর্যন্ত কীর্তন চলে।

(২) প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখে জগন্নাথের থালি দেওয়া হয়।

(৩) প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসের ২০ তারিখ আখড়ার প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।

(৪) প্রতিরবিবার আখড়ায় নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

২। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীঠাকুর জগন্নাথ আশ্রম।**

(খ) স্থান ঃ আনোয়ারপার।

(গ) স্থাপনকাল ঃ আনুমানিক ২০০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপন করা হয়।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণব বাবাজির নামেই আখড়ার নামকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে এই আখড়ায় কোনো সেবায়েত নেই। স্থানীয় জনসাধারণ আখড়ার দেখাশুনা করেন।

৩। (ক) আখড়ার নাম ঃ **অতুল গোসাঁইয়ের আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ বর্ণিবাগান (আলগাপুর)।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ অতুল গোসাঁই। তিনি ভেকধারী বৈষ্ণব।

(ঙ) অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণব ধর্মমতে যেসব অনুষ্ঠান রয়েছে প্রায় সবই এখানে যথাসাধ্য পালন করা হয়। তবে বিশেষত ফাল্গুন মাসে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

৪। (ক) আখড়ার নাম ঃ **ভানু গোসাঁইয়ের আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ বর্ণিপার-২য় খণ্ড, আলগাপুর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছিল।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ কে এই আখড়াটি স্থাপন করেছিলেন তার সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বর্তমানে এই আখড়ার সেবাইত হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন শ্রী ভানু গোসাঁই। এবং তাঁর নামেই আখড়ার নামকরণ হয়ে গিয়েছে 'ভানু গোসাঁইয়ের আখড়া'।

(ঙ) বৈষ্ণবধর্মে প্রচলিত সব অনুষ্ঠানই এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

৫। (ক) আখড়ার নাম ঃ **'শ্রীশ্রীগোপালগোবিন্দ জিউ'র আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ কালীনগর (কাটাখাল)

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি (১১৯৬ বঙ্গাব্দের ২১শে মাঘ এই আখড়াটি স্থাপিত হয়। আখড়ার ইতিহাস নিম্নে আলোচনা করা হল।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ স্থাপনকর্তার প্রকৃত নাম জানা না-গেলেও তাঁকে সবাই ফলাহারী বাবা বলেই ডাকতেন। তিনি ফলমূল খেয়েই জীবনধারণ করতেন বলেই তাঁকে এই নামে ডাকা হত। ফলাহারী বাবার পরবর্তী সময়ে যেসব বৈষ্ণব বা সাধুসন্ত এখানে এসেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন— সর্বশ্রী মনোহর দাস বৈষ্ণব, ত্রিলোচন দাস বৈষ্ণব, পীতাম্বর দাস বৈষ্ণব, ভূবন দাস বৈষ্ণব, শুকদেব দাস সন্ন্যাসী ও নির্মল দাস বৈষ্ণব প্রমুখ।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ সুবল দাস বৈষ্ণব।

(চ) ইতিহাস ঃ ১৭৮৮ খ্রিঃ পূর্বে কালীনগর এলাকার জনবসতি প্রায় ছিল না। ছিল বন-জঙ্গলে ঘেরা এক বৃহৎ এলাকা। এই এলাকায় রয়েছে নদী, নালা, খাল, বিল, হাওর ও প্রচুর গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এই গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে বেশি ছিল 'ইকড়'। পান চাষ করতে 'ইকড়ের' গুরুত্ব খুব বেশি। তৎকালীন সিলেট অঞ্চল থেকে বারজীবী বা বারুই সম্প্রদায়ের লোক এখানে ইকড় সংগ্রহ করতে আসতেন। এসব লোকেরা ইকড় সংগ্রহ করতে একদিন আবিষ্কার করেন 'জনমানবশূন্য ঘন জঙ্গলের মধ্যে এক অপরূপ দর্শন মূর্তিসহ গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে আছেন এক ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। নিজগুণে পরিদৃশ্য এই অপরূপ মূর্তিটির বর্তমান শ্রীশ্রীগোপাল গোবিন্দ জিউর আশ্রমের শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ 'শ্রীশ্রীগোপাল গোবিন্দ জিউ'।

যারা 'ইকড়' কাটতে গিয়েছিলেন তাদের সবিনয় অনুরোধে একটি স্থায়ী জায়গায় বাঁশবেত দিয়ে মন্দির নির্মাণ করে দেন। পরবর্তী সময়ে এই মন্দিরের জন্য ১৫০ বিঘা জমি বরাদ্ধ করা হয়। বর্তমানে মন্দিরের জন্য ১৫ বিঘা জমি রয়েছে— যেখানে নানা অনুষ্ঠান পালন করা হয়। তাছাড়া স্থানীয় জনগণের আর্থিক সহায়তায় বর্তমানে সুরম্য মন্দির তৈরি হয়েছে। এখানে উল্লেখনীয়, কালীনগরের উন্নয়নে বিশেষত মন্দির, আখড়া, স্কুল, কলেজ কিংবা হাসপাতাল নির্মাণে শ্রী সারদা চরণ দে'র অপরিসীম অবদান রয়েছে।

(ছ) উল্লেখযোগ্য সেবাইয়েতদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ

(১) শ্রীশ্রীশুকদেব দাস ঃ তিনি সুদূর উত্তর প্রদেশ থেকে এখানে এসেছিলেন। সন্ন্যাসীর মতোই তাঁর দিন অতিবাহিত হত। তিনি ছিলেন জটাধারী সাধু। তাঁর গায়ে সবসময় ভূষি মাখা থাকত, গাঁজা খেতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। চা-রুটি দিয়ে গোবিন্দজীর ভোগ দিতেন। অনেক ভক্তবৃন্দ সন্ন্যাসীর আচরণে ভয় পেত।

(২) নির্মল দাস বাবাজি ঃ তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। প্রথম জীবনে তিনি গৃহী ছিলেন। তাঁর একজন সহযোগী বৈষ্ণবীও ছিলেন। নির্মলদাস বাবাজি নিজ হাতে রান্না করে গোবিন্দ জিউর ভোগ নিবেদন করতেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মন্দিরটির প্রচুর উন্নতি ঘটেছিল।

(৩) গোপীচরণ বৈষ্ণব ঃ নির্মল দাস বাবাজির পর সেবায়েত হিসেবে নিযুক্ত হন গোপীচরণ বাবাজি। অনুষ্ঠান বা উৎসবাদি ঃ শ্রীশ্রীগোপালগোবিন্দ জিউর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিয়মিত বৈষ্ণবীয় উৎসবাদি পালন করা হয়। সেইসঙ্গে বৈষ্ণব ভাবনার সঙ্গে লোক উৎসবের মিশ্রণে সর্বজনীন উৎসব আকারে পালিত হয়ে আসছে ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী (শ্রীকৃষ্ণের), রথযাত্রা, দোলযাত্রা ও মঙ্গল আরতি ইত্যাদি।

ঝুলনযাত্রা ঃ ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে শ্রীশ্রীগোপালগোবিন্দ জিউর মন্দিরে তিনদিন ব্যাপী ঝুলন গান পরিবেশিত হয়। নানাস্থান থেকে গায়ক-গায়িকারা ঝুলন গানে অংশগ্রহণ করেন। সেইসঙ্গে বসে সঙ্গীতের জমজমাট আসর। কিন্তু সময় ও সমাজের পরিবর্তনের হাওয়ায় আজকাল সেই সঙ্গীতের আসর আর অনুষ্ঠিত হয় না।

জন্মাষ্টমী ঃ শ্রীশ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী প্রতি বৎসর এই মন্দিরে পালন করা হয়। এই উপলক্ষে পুরো রাত্রব্যাপী গানকীর্তন এবং পরের দিন নন্দ উৎসব পালন করা হয়। সেইসঙ্গে নন্দ উৎসবের দিন দুপুরবেলা গোবিন্দের মহাপ্রসাদ সবাই গ্রহণ করেন।

মঙ্গলারতি ঃ বৈষ্ণবীয় রীতি অনুযায়ী কার্তিক মাস হল নিয়ম মাস। এই কার্তিক মাসে বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ ভোরবেলা মঙ্গলারতি কীর্তন করেন। তবে এই কীর্তনের নেতৃত্বে থাকেন আখড়া বা মন্দিরের বৈষ্ণব। শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর আখড়ায় পূর্বে নিয়ম মাসের শেষ রাত্রিতে পুরো রাত্র মঙ্গলারতি কীর্তন অনুষ্ঠিত হত। সেইসঙ্গে পরের দিন সকাল বেলা কীর্তন সহযোগে পুরো গ্রাম পরিক্রমা করা হত। কিন্তু বর্তমানে সেই গান-কীর্তনের উন্মাদনা বিশেষ নেই। বর্তমানে শুধু নিয়ম রক্ষার উৎসব পালিত হয়।

রথযাত্রা ঃ শ্রীশ্রীগোপালগোবিন্দ জিউর আশ্রমে বৎসরে দুইবার রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম আষাঢ় মাসে এবং দ্বিতীয় পৌষ মাসে। আষাঢ় মাসে জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে এবং পৌষ মাসে পৌষ সংক্রান্তির উপলক্ষে। এই দুই রথযাত্রা উৎসবে প্রচুর ভক্ত সমাবেশ ঘটে। জাতপাত ধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষ রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে মেলা বসে এবং মেলায় সব শ্রেণির মানুষ আনন্দ উপভোগ করেন।

দোলযাত্রা ঃ দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন বিকেল বেলা হোলির গান ও রঙ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া পূর্ণিমার দিন রাত্রব্যাপী দুই দলের গানের লহরীর সাথে সাথে রঙ বা আবির খেলাও প্রচলিত ছিল একসময়। কিন্তু বর্তমানে যেন এসব কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে অতল গভীরে।

শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ঃ কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে শ্রীশ্রীগোপালগোবিন্দ জিউর আশ্রমের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে হরিনাম সংকীর্তনের এক জমজমাট আসর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ১৬ প্রহর নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রীগোপালগোবিন্দ জিউ আশ্রমের পুজোর দৈনন্দিন প্রণালী ঃ (১) প্রতিদিন তিনবেলা গোবিন্দের ভোগ নিবেদন করা হয়। ভোরবেলা ভক্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে মন্দিরের দরজা খোলা হয় এবং বাল্যভোগ নিবেদন করা হয়।

(২) দুপুরবেলা অন্ন, ডাল, সব্‌জি ও পায়েস ইত্যাদি সহযোগে রাজভোগ নিবেদিত হয়। সেই সময় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ পরম সানন্দে ভোগের প্রসাদ খেয়ে অশেষ তৃপ্তিলাভ করেন। তাছাড়া প্রায়দিনই ভক্তরা ব্যক্তিগতভাবে ভোগ নিবেদন করেন।

(৩) সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যারতি ও পরবর্তী সময়ে রাত্রের ভোগ নিবেদন করা হয়। নিয়মিত ভোগ অনুষ্ঠান ছাড়াও গ্রামের লোকেরা নানা লৌকিক ও পারলৌকিক আচার অনুষ্ঠান অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গোবিন্দজীর মন্দিরে সুসম্পন্ন করেন। প্রায় সময় যেসব অনুষ্ঠান এই আশ্রমে সুসম্পন্ন হয় সেগুলি হল— অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধাদির পর বৈষ্ণবসেবা, বিয়ের পর বরকনে গোবিন্দজীর আশ্রমে এসে প্রণাম জানানো, বিয়ের পূর্বে রীতি অনুযায়ী আশ্রমে এসে পান-সুপারি দিয়ে গোবিন্দকে মান্যতা বা আপ্যায়িত করা ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায়, কালীনগর অঞ্চলবাসীর নানা সুখদুঃখের একমাত্র আশ্রয়স্থল হল শ্রীশ্রীগোবিন্দ জিউর আশ্রম।

(জ) ১৯৮০ সন থেকে এই আশ্রমটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণ। এই সময়েই Religious Cheritable Act এর মাধ্যমে সরকার আশ্রমের পুরো জমি সরকারীভাবে অধিগ্রহণ করে। নিয়ম অনুযায়ী সরকারী পঞ্জিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবং এই নিয়ম অনুযায়ী পরিচালনা কমিটিও গঠন করা হয়। নিয়মানুসারে জেলাধিপতি হন কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদকসহ অন্যদের নির্বাচিত করা হয়।

১৯৮০ সনে যে কমিটি গঠন করা হয়, সেখানে জেলাধিপতিকে বাদ দিয়ে সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন শ্রী বিনয়কৃষ্ণ দে মহাশয় (প্রাক্তন অধ্যক্ষ) এবং সদস্যরা ছিলেন যথাক্রমে পতীন্দ্র চন্দ্র দে, ধ্রুবলাল পাটিকর, ইন্দ্রমণি দাস, প্রদ্যুম্ন কুমার কর, কার্তিক চন্দ্র দে ও বিনয়কৃষ্ণ দাস। সব আশ্রম বা মঠ-মন্দিরের মতো এই গোপালগোবিন্দের আখড়ায়ও জমি সংক্রান্ত মামলা-মোকর্দ্দমা হয়েছিল। যারা আশ্রমের জমি ভোগ করছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই ওইসব জমিকে নিজের জমি বলে দাবী করে বসেন। যাই হোক পরবর্তী সময়ে এসব সমস্যার কমবেশি সমাধান হয়েছে। বর্তমানে যে কমিটি আশ্রমের পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সেই কমিটির সদস্যরা হলেন, সভাপতি— জেলাধিপতি, সম্পাদক— শ্রীবিনয়কৃষ্ণ

দে এবং অন্যান্য সদস্যরা হলেন— শ্রী ধীমান দে, শ্রী বিকাশরঞ্জন দে, শ্রী সবুজ রায়, শ্রী মন্মথ দে ও সমরজিৎ দে।

৬। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীরাধামাধব আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ দাস কলোনী, পাঁচগ্রাম।

(গ) স্থাপন কাল ঃ ১৯৯৭ ইংরেজি।

(ঘ) প্রথম বৈষ্ণব ও স্থাপনকর্তা ঃ শ্রী ভবানন্দ দাস বৈষ্ণব ও লবঙ্গ দাস বৈষ্ণবী। তারা দুইজনই বর্তমানে এই আখড়ার সেবায়েত হিসেবে রয়েছেন।

(ঙ) এই বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী দুজনই মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের দীক্ষায় দীক্ষিত। এ ছাড়া তাঁরা ভেকধারী বৈষ্ণব।

(চ) অনুষ্ঠান ঃ প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের ২৭ (সাতাশ) তারিখ নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, রথ, নিয়ম মাস ইত্যাদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

৭। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর আশ্রম।**

(খ) স্থান ঃ বাঘমারা (পলারপার)

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৬-০৩-২০০৯

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ দীগেন্দ্র সিংহ, নগেন্দ্র সিংহ, নিতাইরাম সিংহ ও গহেন্দ্ররাম সিংহ।

(ঙ) প্রথম বৈষ্ণব ঃ ভবানন্দ বৈষ্ণব। বর্তমানে তিনি সেবায়েতের কাজ পরিচালনা করেন।

(চ) বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কায়িত সবই অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

৮। (ক) আখড়ার নাম ঃ **রাধাগোবিন্দ আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ চণ্ডীপুর (হাইলাকান্দি)।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত করা হয়। তবে নির্দিষ্ট সন-তারিখ জানা যায়নি।

(ঘ) স্থাপনকর্তা বা প্রধম বৈষ্ণব ঃ সরলদাস বৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান বৈষ্ণব বা সেবায়েত ঃ সদানন্দ বৈষ্ণব। বৈষ্ণবীর নাম জানা যায়নি।

(চ) অনুষ্ঠান বা উৎসব ঃ বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কায়িত সব ধরনের উৎসব এখানে পালন করা হয়।

৯। (ক) আখড়ার নাম ঃ **রাধাগোবিন্দ আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ পালইছড়া (কাটলিছড়া)

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৪৪ ইংরেজি।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীগুরু সনাতন গোস্বামী এবং বৈষ্ণবীর নাম জানা যায়নি।

(ঙ) বর্তমান বৈষ্ণব ঃ শ্রীহরিদাস বৈষ্ণব ও ললিতা দাস বৈষ্ণবী।

(চ) অনুষ্ঠান ঃ ঝুলন, রথযাত্রা, নিয়ম মাস সবই এই আখড়ায় পালিত হয়।

১০। (ক) আখড়ার নাম ঃ **জহবপুর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ ঘাড়মুড়া (কাটলিছড়া)।

(গ) স্থাপনকর্তা ঃ শশীনন্দন গোস্বামী। তিনি বর্তমানেও এই আখড়ার সেবায়েত।

(ঘ) উৎসব ঃ বর্তমানে আর্থিক দুরবস্থার জন্য আখড়াকে কেন্দ্র করে কোনো বড় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় না। তবে সেবায়েতরা নিজ আর্থিক ক্ষমতায় যতটুকু পারেন উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করেন। তবে এই আখড়াটি অনেক পুরানো।

১১। (ক) আখড়ার নাম ঃ **দাড়িয়াঘাট আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ দাড়িয়াঘাট (ঘাড়মুড়া), কাটলিছড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ আনুমানিক ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ রাধারমণ গোস্বামী। তিনি বর্তমানেও এই আখড়ার সেবায়েত।

(ঙ) উৎসব ঃ ঝুলন, রথযাত্রা, নিয়ম মাস সহ বৈষ্ণবধর্মে পালিত সবই অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

১২। (ক) আখড়ার নাম ঃ **দামোদর গোস্বামীর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ ঘাড়মুড়া বাসস্টেণ্ড (কাটলিছড়া)।

(গ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীদামোদর গোস্বামী। তিনি বর্তমানেও এই আখড়ার সেবায় নিয়োজিত। বিশেষভাবে বলা যায়, এই আখড়াটি বেশি পুরানো নয়। আজ থেকে ১০-১২ বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীদামোদর গোস্বামী এই আখড়াটি প্রতিষ্ঠা করেন।

(ঘ) উৎসব ঃ আখড়ার সেবায়েত দামোদর গোস্বামী নিজ সাধ্যমত যতটুকু সম্ভব বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে জড়িত উৎসবাদি পালন করেন।

১৩। (ক) আখড়ার নাম ঃ **বালিরবন্দ আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ বাগান বস্তি, জামিরা (কাটলিছড়া)

(গ) স্থাপনকর্তা ও ভূমিদাতা ঃ শরৎদাস বৈষ্ণব। তিনি সহজিয়া মতাবলম্বী বৈষ্ণব।

(ঘ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ।

(ঙ) অনুষ্ঠান ঃ ঝুলন, রথযাত্রা, নিয়ম মাস ইত্যাদি নিয়মানুসারে আখড়ায় পালন করা হয়।

১৪। (ক) আখড়ার নাম ঃ **সুলতানী আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ সুলতানী, কাটলিছড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ও প্রথম বৈষ্ণব ঃ এই আখড়াটির স্থাপনকর্তা হলেন কালীকুমার নন্দী মহাশয়। তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর বৈষ্ণবীয় নাম হয় কালীদাস বৈষ্ণব। তিনিই হলেন এই আখড়ার প্রথম বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখনীয়, কালীদাস বৈষ্ণবের বৈষ্ণবী ছিলেন কিন্তু তাঁর নাম জানা যায়নি।

(ঙ) ভূমিদাতা ঃ আখড়ার জন্য ভূমি দান করেন সুলতানী চা-বাগানের মালিক গোপালকৃষ্ণ সারদা। এখানে উল্লেখনীয়, একসময় এই আখড়াটি বাগানের মধ্যে অবস্থিত ছিল। পরবর্তী সময়ে বাগান থেকে আখড়াটি সরিয়ে আনা হয়। বর্তমানে এই বাগানটি ক্রয় করেছেন বরাকের সুসন্তান ও তরুণ গগৈ মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী শ্রীগৌতম রায় মহাশয়। তিনি আখড়াটিকে ক্রয় করা জমি

থেকে সরিয়ে আলাদা ভাবে জমি দান করেছেন। শ্রীগৌতম রায় হলেন কাটলিছড়া বিধানসভা চক্রের বিধায়ক। তিনি শুধু জমি দান করেননি, সঙ্গে আর্থিক সাহায্যও করেছেন মন্দির নির্মাণের জন্য।

(চ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী অনঙ্গ বৈষ্ণবী। তিনি সহজিয়া সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। তিনি একাই আখড়ার সমস্ত কাজকর্ম করেন।

(ছ) অনুষ্ঠান ঃ ঝুলন, রথযাত্রা, নিয়ম মাস সহ সবই অনুষ্ঠান এই আখড়ায় অনুষ্ঠিত হয়।

১৫। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীগোপাল জিউ রাধারমণ জিউ আশ্রম।**

(খ) স্থান ঃ মাধবপুর, কারিছড়া (কাটলিছড়া)।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ০৬-০১-১৩৮৭ বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ আজ থেকে ১৫ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ও প্রথম বৈষ্ণব ঃ অদৈত্য দাস গোস্বামী এবং সুদেবী বৈষ্ণবী। তারা বর্তমানেও এই আখড়ায় সেবায়েত হিসেবে নিয়োজিত।

(ঙ) অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়ায় দোলযাত্রা, ঝুলন এসব অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া কার্তিক মাসে 'মঙ্গলা' অনুষ্ঠান হয়। এই সময়ে প্রতিদিন সকালবেলা মঙ্গলারতি অনুষ্ঠান হয়। তবে বিশেষত দেবী দুর্গার বিসর্জনের দিন (দশমী) থেকে 'উত্থান একাদশী' যে দিন আরম্ভ হয় সেইদিন অর্থাৎ ত্রিশ দিন পূর্ণ হলে 'মঙ্গলা' শেষ হয়। যেদিন একমাস পূর্ণ হয় বা মঙ্গলার শেষ দিন নাম-সংকীর্তনের মধ্যদিয়ে এই মঙ্গলা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

১৬। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মদনমোহন আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ মাধবপুর, কারিছড়া (কাটলিছড়া)।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে স্থাপিত। প্রকৃত সন-তারিখ জানা যায়নি।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীমদনমোহন বৈষ্ণব ও বিশাখা বৈষ্ণবী।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ মাধবী বৈষ্ণবী।

(চ) অনুষ্ঠান ঃ ঝুলন, নিয়ম মাস, নাম-সংকীর্তন সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সব অনুষ্ঠানই নিয়মমাফিক হয়। কিন্তু সর্বজনীনভাবে বৃহৎ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব হয় না আর্থিক অসুবিধার জন্য। এখানে উল্লেখনীয়, এই আখড়ায় নিজস্ব প্রচুর জমি ও সম্পত্তি একসময় ছিল। বর্তমানে পরিচালনার অভাবে এবং স্বার্থন্বেষী মানুষের কূটচালে আখড়ার সম্পত্তি বেদখল হয়েছে।

১৭। (ক) আখড়ার নাম ঃ **প্রমোদনগর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ কদমতলা (কাটলিছড়া)।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীজয়দেব বৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান বৈষ্ণব বা সেবায়েত ঃ তাদের নাম সংগ্রহ করা যায়নি।

(চ) অনুষ্ঠান ঃ প্রায় সব অনুষ্ঠানই এখানে পালিত হয়।

১৮। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ চৌরঙ্গী, কাটলিছড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ও প্রথম বৈষ্ণব ঃ শ্রীশ্রীনির্মল দাস বৈষ্ণব ও মথুর দাস বৈষ্ণবী।

(ঙ) বর্তমান বৈষ্ণব ঃ শ্রী সর্বানন্দ দাস বৈষ্ণব সেবায়েত হিসেবে এই আখড়ায় আছেন। তিনি ভেকধারী সহজিয়া বৈষ্ণব।

(চ) অনুষ্ঠান ঃ ঝুলন, রথযাত্রা, নিয়ম মাস সহ বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে জড়িত সব অনুষ্ঠানই এই আখড়ায় অনুষ্ঠিত হয়।

১৯। (ক) আখড়ার নাম ঃ **গৌড়ীয় মঠ, লালাবাজার (হাইলাকান্দি)**।

(খ) স্থাপন কাল ঃ ১১-১০-১৯৮১।

(গ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ। তিনি নিজের একক প্রচেষ্টায় মঠের কাজ আরম্ভ

করেন। এ ছাড়া স্থানীয় ও বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অর্থ সাহায্যে এই মঠের কাজ সম্পূর্ণ হয়। এখানে উল্লেখনীয়, প্রতিষ্ঠাপক সাগর মহারাজ মঠের কাজ আরম্ভ করলেও তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীশ্রীভক্তিহৃদয় ঋষিকেশ মহারাজ। এ ছাড়া এই মঠের পরিকল্পনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীপাদ সনাতন দাসধিকারী।

(ঘ) বর্তমান সেবায়েত ঃ **শ্রীশ্রীশ্রৌতি মহারাজ** (২০০৪ - বর্তমান)।

(ঙ) গৌড়ীয় মঠের মহারাজ বা বৈষ্ণবদের নির্দিষ্ট নিয়ম ঃ

(১) এই মতবাদে বিশ্বাসী বৈষ্ণবেরা সদায় নিরামিষভোজী। তাঁরা কখনও আমিষ জাতীয় খাবার স্পর্শ করেন না। এমনকী চা, পান-সুপারি থেকে আরম্ভ করে কোনো ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করেন না।

(২) কোনো শিষ্য যদি অবিবাহিত থাকেন তবে তাকে ব্রহ্মচারী উপাধি দেওয়া হয়।

(৩) আবার কোনো বিবাহিত শিষ্য যদি বৈষ্ণব হতে ইচ্ছে প্রকাশ করে তবে তাকে 'স্ত্রী' ত্যাগ করে বৈষ্ণব হতে হবে।

(৪) বর্ণাশ্রম প্রথা মেনে চলা হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এই মতবাদে লুকিয়ে রয়েছে। এখানে উল্লেখনীয়, চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে জাতপাতের তথা বর্ণাশ্রম প্রথার কোনো স্থান নেই। আর এখানেই চৈতন্যদেবের মতের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পার্থক্য।

(৫) গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা গৈরিক বস্ত্র (ত্যাগী বস্ত্র) পরিধান করতে হয়।

(৬) গৌড়ীয় মতবাদে বিশ্বাসী প্রত্যেক বৈষ্ণবেরা 'দাস' উপাধি গ্রহণ করতে হয়।

(৭) কোনো পুরুষ ব্যক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় দীক্ষা গ্রহণ করলে যজ্ঞের মাধ্যমে করতে হয় এবং তাকে বিষ্ণুপ্রবর ও অচ্যুৎ গোত্র হিসেবে মেনে নিতে হয়। এবং সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করলে দণ্ড-ত্রিদণ্ড নাম দেওয়া হয়।

(চ) অনুষ্ঠান ঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রীতি অনুযায়ী সবই অনুষ্ঠান এই মঠে অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও তিনবেলা ভোগ দেওয়া, সন্ধ্যারতি, ভজন-কীর্তন সবই হয়। দুপুরের ভোগের পর বিশেষত সর্বসাধারণকে প্রসাদ দেওয়া হয়। তবে অন্যান্য ভোগের পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

২০। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীনিতাই গৌর আশ্রম।**

(খ) স্থান ঃ ১০ নং ওয়ার্ড, লালাবাজার (হাইলাকান্দি)।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ (১৯৫০ ইং)।

(ঘ) স্থাপনকর্তা বা প্রথম বৈষ্ণব ঃ শ্রীশ্রীহরিদাস গোস্বামী।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রীশ্রীহরিপ্রিয়া চাঁদ ব্রজবাসী গোস্বামী। তিনি মধ্বাচার্য শ্রেণির বৈষ্ণব।

(চ) অনুষ্ঠান ঃ ঝুলন, রাস, রথ সবকিছুই অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে জড়িত সবই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এ ছাড়া বিশেষভাবে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের ১৫ তারিখ অধিবাস ও ১৬ তারিখ অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

২১। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীনিতাই গৌরসুন্দর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ ৯ নং ওয়ার্ড, লালাবাজার।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৮-১২-১৩৯১ বঙ্গাব্দ (১৯৮৪ ইং)।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীপাদ প্রেমানন্দ দাস ব্রজবাসী গোস্বামী ও প্রমিলা গোস্বামী।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ বর্তমানে এই আখড়ায় দুজন বৈষ্ণবী সেবায়েত হিসেবে রয়েছেন। তাঁরা দুজন হলেন— মোহনপ্রিয়া বৈষ্ণবী ও চন্দ্রদিনী বৈষ্ণবী। এখানে উল্লেখনীয় চন্দ্রদিনী বৈষ্ণবী হলেন 'রামায়তী' সম্প্রদায়ভুক্ত।

(চ) এই আখড়ায় রথ, ঝুলনযাত্রা, নিয়ম মাস, সন্ধ্যারতি, নাম-সংকীর্তন সবই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

২২। (ক) আখড়ার নাম ঃ **রামগোপাল আশ্রম।**

(খ) স্থান ঃ ১০ নং ওয়ার্ড, আটালি/সূর্যসেন সরণি রোড, লালাবাজার।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৭০ ইংরেজি।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীরসমণি বৈষ্ণবী।

(ঙ) বর্তমান সেবাইত/বৈষ্ণব ঃ প্রেমানন্দ বৈষ্ণব ও প্রমিলা বৈষ্ণব।

(চ) এই আখড়ার প্রত্যেকেই 'মাজবাড়ি মধ্বাচার্য' সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা নিজস্ব নির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি পালন করেন। এই নিয়মগুলো হল—

(১) সকালবেলা প্রথমেই গৌরজাগরণ, গোপাল জাগরণ ও জলতুলসী (উপলভোগ)।

(২) মধ্যাহ্নবেলায়, বিশেষত ১২.০০ - ১২.৩০ এর মধ্যে অন্নব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়।

(৩) সায়াহ্নে অর্থাৎ বিকেলবেলায় গুরু, গৌর, কৃষ্ণ, রাধা ও তুলসী আরতি করতে হয়। এই পাঁচটি আরতির পর নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। কীর্তনের পর সন্ধ্যাসেবা দেওয়া হয়। সন্ধ্যাসেবার পর মহাপ্রভুর শয়ন ও নিদ্রা দেওয়া হয়।

(ছ) এই আখড়ায় বৈষ্ণবধর্মে পালিত সবধরনের অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

২৩। (ক) আখড়ার নাম ঃ **রাধামাধব আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ ১০ নং ওয়ার্ড, আটালি/সূর্যসেন সরণি রোড, লালাবাজার।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ আটালি অঞ্চলের জমিদার ভাইয়েরা যথাক্রমে রামদুলাল, শান্তিরাম, আরাধন, রামজীবন ও রতিরামবাবু এই আখড়ার জন্য প্রচুর জমি দান করেছিলেন। কালের প্রবাহে জমিদারদের জমিদারী চলে যায় এবং যারা জমিগুলি ভোগ করছিলেন, তারা নিজেদের নামে জমি নামজারী করে নেন। তারা আর আখড়ার জমি ফিরিয়ে দেননি। তবে এসব কাজে সাহায্য করেছে সরকারী নিয়ম। যাই হোক, এইসব গোপন তথ্য যিনি প্রদান করেছেন তিনি তার নাম প্রকাশ করতে মানা করেছেন। এতকিছু পরও আখড়ার কিছু জমি এখনও রয়েছে। বর্তমানে কমিটি এসব দেখাশুনা করে।

(ঙ) প্রথম বৈষ্ণব ঃ চরণদাস বাবাজি। এখানে উল্লেখনীয় বর্তমানে এই আখড়ায় কোনো বৈষ্ণব নেই। বৈষ্ণব না-থাকারও কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।

২৪। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীষড়ভোজ মহাপ্রভুর আখড়া** (বড় আখড়া)।

(খ) স্থান ঃ ছেঙবিল, লালারপার (মহাপ্রভু সরণি), লালাবাজার।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ (ইংরেজি ১৮৭৯)।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীশ্রীচন্দ্রকিশোর দাসবৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত বা বৈষ্ণব ঃ শ্রী ভবানন্দ বৈষ্ণব ও রসপ্রিয়া বৈষ্ণব। এই দুইজন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত।

(চ) অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়াটি লালাবাজার অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো আখড়া বলে মনে হয়। এ ছাড়া এই আখড়াটিকে 'বড় আখড়া' নামে অভিহিত করা হয়। তাই বৈষ্ণব ধর্মমতে যত ধরনের অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে সবই এই আখড়ায় পালন করা হয়।

(ছ) সাহিত্যকৃতি ঃ এই আখড়ার সেবায়েত রসপ্রিয়া বৈষ্ণবী রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে অনেক সঙ্গীত রচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি 'ভক্তিমালা' ও 'আত্মাজান' নামে দুটি বৈষ্ণব তত্ত্বের গ্রন্থ লিখেছেন।

২৫। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীরাধারমণ রাধাগোবিন্দ মঠ।**

(খ) স্থান ঃ মুক্তাছড়া, লালাবাজার।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৯২ ইংরেজি।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীহরিদাসী বৈষ্ণবী। তাঁর ভেকপূর্ব নাম ছিল হেমলতা নাথ।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ নিত্যানন্দ দাস বাবাজি এবং আরাধিকা দেবী। তারা উভয়ই নরোত্তম পরিবারের দীক্ষায় দীক্ষিত।

(চ) পুজোর নিয়ম ও এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ঃ এই মঠ অন্যান্য বৈষ্ণব আখড়ায় প্রচলিত নিয়মকানুন থেকে কিছু আলাদা। এখানে রাধারমণ বিগ্রহের আরাধনা করা হয়। তাদের ইষ্ট দেবতা হলেন রাধাবিনোদ। তিনজন শালগ্রাম ও তিনজন গোপাল রয়েছেন। শ্রীশ্রীরমণীমোহন হলেন তাদের দাদাঠাকুর। রাধারমণ ঠাকুরের বৈষ্ণব তত্ত্বে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। এই ধর্মমতে বৈষ্ণবেরা সাদাবস্ত্র পরিধান করেন।

(ছ) সাহিত্যকৃতি ঃ আরাধিকা বৈষ্ণবীর লেখা কয়েকটি ধর্মপুস্তক রয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল— 'তত্ত্বকথা', 'আসামের সপ্তকন্যা' (কাব্যগ্রন্থ) ইত্যাদি।

(জ) অনুষ্ঠান বা উৎসব ঃ ঝুলন, রথযাত্রা, নিয়ম মাস সহ সবই অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

২৬। (ক) আখড়ার নাম ঃ **হাইলাকান্দি বাজার আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ হাইলাকান্দি বাজার।

(গ) স্থাপনকাল ঃ আনুমানিক ১৯৫০ ইংরেজিতে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ দেবেন্দ্র নাথ এবং প্রথম পুজারী ছিলেন রুক্মিণীকুমার চক্রবর্তী।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী মদনমোহন বৈষ্ণব ও সত্যপ্রিয়া বৈষ্ণবী। এখানে উল্লেখ্য তাদের ভেক নেওয়ার পূর্বনাম ছিল শ্রীমৃণালকান্তি দেবনাথ ও স্বপ্না দাস। উভয়েই মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত।

(চ) আখড়াটির ইতিহাস ঃ এই আখড়ায় স্থাপিত শ্যামসুন্দর মূর্তিকে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। ভারত ভাগ হওয়ার সময়ে পূর্বপাকিস্থান থেকে আগত দেবেন্দ্রনাথ এই মূর্তিটি নিয়ে এসেছিলেন। তিনিই আখড়ায় স্থাপন করে পূজারী নিযুক্ত করেন। কিন্তু পরমুহূর্তে তার উত্তরপুরুষদেরকে আর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বর্তমানে একটি কমিটির মাধ্যমে আখড়ার কাজকর্ম পরিচালনা করা হয়।

(ছ) উৎসব অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যেসব অনুষ্ঠান প্রচলিত সেগুলি এই আখড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষভাবে রাসপূর্ণিমাতে ১৬ প্রহর নামকীর্তনের আসর বসে এবং বিভিন্ন স্থান থেকে কীর্তনিয়ারা আসেন নামসংকীর্তন গাওয়ার জন্য।

২৭। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীরাধারমণ আশ্রম।**

(খ) স্থান ঃ রবীন্দ্রসরণি, হাইলাকান্দি।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।

(ঘ) প্রথম সেবায়েত ঃ গৌতম চক্রবর্তী। তিনি বৈষ্ণব নন; পুরোহিত সম্প্রদায়ের লোক।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ রেখারাণী বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখ্য তাঁর পূর্বনাম ছিল রাধারাণী দত্ত।

(চ) আশ্রমের ইতিহাস ও উৎসব ঃ এই আশ্রমটি বারইগ্রামের 'শ্রীশ্রীরাধারমণ আশ্রমের' উপশাখা। যাই হোক এই আশ্রমে গুরুপূর্ণিমা, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, বাসন্তী পুজো, রাধারমণ গোস্বামীর জন্মোৎসব ও তিরোধান উৎসব পালন করা হয়।

২৮। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির।**

(খ) স্থান ঃ কলেজ রোড, হাইলাকান্দি।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ২৯-০১-১৯৯০ ইংরেজি।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাতা ঃ শ্রীশ্রীবিনোদ কিশোর গোস্বামী। তিনি নিত্যানন্দ পরিবারের দীক্ষিত। প্রথম সেবায়েত— শ্রী যোগেশ চন্দ্র গোস্বামী।

(ঙ) তথ্যদাতা ঃ শ্রী জয়কুমার নাথ।

(চ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী সর্বানন্দ দাস বৈষ্ণব ও শ্রীমতি সাবিত্রী দাস বৈষ্ণবী।

(ছ) মন্দিরের ইতিহাস ঃ সন্তোষকুমার রায় (প্রাক্তন বিধায়ক) ও প্রজেশ দেবরায়ের প্রচেষ্টায় এই মন্দির স্থাপিত হয়। এখানে উল্লেখনীয়, উভয়ের আহ্বানে শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত খেলার মাঠে এক গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে হাইলাকান্দি মডেল কলোনীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এই সিদ্ধান্তের উপরও ভিত্তি করে পুজ্যপাদ শ্রীশ্রীবিনোদ কিশোর গোস্বামী মহাশয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় এই মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে গোস্বামী মহাশয় মন্দিরের জন্য ৫০০.০০ (পাঁচশ টাকা) দান করেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর পরিচালনা সমিতি দ্বারা সেবায়েত হিসেবে শ্রীযোগেশ চন্দ্র গোস্বামীকে নিয়োগ করা হয়। তিনি ছিলেন ঠাকুরবাণী গুরুর শিষ্য। তাঁকে মাসিক ভাতায় সেবায়েত হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি প্রায় সুদীর্ঘ ১৫ বৎসর এই মন্দির বা আখড়ায় সেবায়েত হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মন্দির বা আখড়াটি স্থাপন হওয়ার পর যে পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সন্তোষ কুমার রায় এবং সম্পাদক প্রমোদ চন্দ্র দেবরায় ছিলেন। এরপর বৎসরে বৎসরে অনেক কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং বেশির ভাগ সময় সন্তোষ কুমার রায় ও প্রমোদ চন্দ্র দেবরায় সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে কাজ পরিচালনা করেছেন। বর্তমান কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে শ্রী ভানু কুমার কর (প্রাক্তন অধ্যক্ষ) ও শ্রী হীরকজ্যোতি সেন।

উক্ত আখড়াটির ভূমি দাতারা হলেন মডেল কলোনীর বসবাসকারী ৪২ টি পরিবার। এই পরিবারগুলি তাদের নিজস্ব বরাদ্ধকৃত জমি থেকে ১৫ কাঠা জমি আখড়ার নামে লিখিতভাবে দান করে। বিশেষভাবে বলা যায়, এটি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির। এই মন্দিরটিতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপিত রয়েছে। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপিত হওয়ার কিছুদিন পরে জনৈক ভক্ত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ কলকাতা থেকে এনে বিনোদকিশোর গোস্বামীর সহযোগিতায় একই কুর্শীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

(জ) উৎসব অনুষ্ঠান ঃ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দিরে যেসব উৎসব পালন করা হয়, সেগুলি হল— (১) প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের ২৯ তারিখ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। (২) গুরু পূর্ণিমা পালন করা হয়। (৩) মাঘী পূর্ণিমা ও দোলযাত্রা পালন করা হয়। (৪) কার্তিক মাসে নিয়ম সেবা ও আকাশবাতি প্রজ্জ্বলন করা এই মন্দিরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

২৯। (ক) আখড়ার নাম ঃ **নরোত্তম গোস্বামীর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ মোহনপুর (হাইলাকান্দি)।

(গ) স্থাপনকাল ঃ আনুমানিক ১৯৮০ ইংরেজি।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রী নরোত্তম গোস্বামী। এখানে উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠাপক নরোত্তম বৈষ্ণব বর্তমানেও এই আখড়ার সেবায়েত হিসেবে আছেন।

(ঙ) উৎসব/অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণব ধর্মে প্রচলিত সব উৎসবই এই আখড়ায় পালন করা হয়।

৩০। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ বাদীরটুক (উত্তর নারায়ণপুর), হাইলাকান্দি।

(গ) স্থাপনকাল ঃ আনুমানিক ২৫০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) প্রথম বৈষ্ণব ও প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রী গগনচাঁদ বৈষ্ণব।

৩১। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীগোপালগোবিন্দ আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ ঝাড়ুকোণা (বড়বন্দ), হাইলাকান্দি।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীগৌরচান্দ বৈষ্ণব। তিনিই এই আখড়ার প্রথম বৈষ্ণব। তাঁর শিষ্যরা বরাক উপত্যকার প্রতিটি স্থানে রয়েছেন।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী চন্দ্রমোহন বৈষ্ণব।

(চ) উৎসব/অনুষ্ঠান ঃ নিয়ম মাস, দোলযাত্রা, ঝুলন সহ সবই অনুষ্ঠান এই আখড়ায় পালন করা হয়।

৩২। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ উত্তর বড়বন্দ (হাইলাকান্দি)।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে আখড়াটি স্থাপন করা হয়।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীশচীনন্দন বৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ বর্তমানে আখড়ায় কোনো সেবায়েত নেই।

৩৩। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ বড়বন্দ (হাইলাকান্দি)।

(গ) স্থাপনকাল ঃ আনুমানিক ৩০-৩১ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রী কৃষ্ণপদ বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখ্য তিনি বর্তমানেও এই আখড়ার সেবাইত হিসেবে রয়েছেন। তিনি নিজেই ভূমিদাতা এই আখড়ার।

(ঙ) অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিটি অনুষ্ঠান এখানে পালন করা হয়।

৩৪। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ আব্দুলাপুর, লালাবাজার।

(গ) স্থাপনকাল ঃ আনুমানিক ৬০-৬১ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রী জয়গোবিন্দ বৈষ্ণব। তিনি সহজিয়া ভেকধারী বৈষ্ণব।

(ঙ) অনুষ্ঠান ঃ দোল উৎসব, ঝুলনযাত্রা, নিয়ম মাস সহ সবই উৎসব এই আখড়ায় পালন করা হয়।

৩৫। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ গাঞ্জাখাউরি, কাটলিছড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৫৯ ইংরেজি।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীঅধরানন্দ বৈষ্ণব। তিনি সহজিয়া ভেকধারী বৈষ্ণব ছিলেন।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী কৃষ্ণানন্দ বৈষ্ণব।

(চ) উৎসব ঃ ঝুলন, নিয়ম মাস, দোলযাত্রা সহ অন্যান্য সবই অনুষ্ঠান এখানে পালন করা হয়।

৩৬। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ লালাপার (লালাবাজার)।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীরাধিকা দাস বৈষ্ণব।

(ঙ) উৎসব ঃ বৈষ্ণবধর্মে পালিত সবই অনুষ্ঠানই এখানে পালন করা হয়।

৩৭। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ ধলাই-মলাই, ৬ষ্ঠ খণ্ড (কাটলিছড়া)।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৫০ ইংরেজি।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ সখিচরণ বৈষ্ণব। তিনি সহজিয়া ভেকধারী বৈষ্ণব ছিলেন।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী হরিদাস বৈষ্ণব। তিনিও সহজিয়া ভেকধারী বৈষ্ণব।

(চ) অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণব ধর্মের রীতি-নিয়ম মেনে এই আখড়ায় সব অনুষ্ঠানই পালন করা হয়। কালের করাল গ্রাসে মানুষ জর্জরিত। এই করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ 'কৃষ্ণনাম' জপ করা। এই আখড়ায় প্রতি বৎসর নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া অন্যান্য উৎসবও পালন করা হয়।

৩৮। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ পূবনিষ্কর (মণিপুর), কাটলিছড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রী সনাতন বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখনীয় শ্রী সনাতন বৈষ্ণব এখনও এই আখড়ার সেবায়েত হিসেবে নিয়োজিত।

(ঙ) উৎসব ঃ বৈষ্ণবধর্মে প্রচলিত সবই অনুষ্ঠান বা উৎসব এখানে পালন করা হয়।

৩৯। (ক) আখড়ার নাম ঃ **জগবন্ধু আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ হস্‌পিটেল রোড, কাটলিছড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রী হরিদাস বৈষ্ণব ও বিনোদপ্রিয়া বৈষ্ণব। মূলত তাদের প্রচেষ্টায় এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে। উক্ত বৈষ্ণব দুজনই বর্তমানে আখড়ার সেবা করে যাচ্ছেন।

(ঙ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ ঝুলন, নিয়ম মাস, দোলযাত্রা সহ সবই অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

৪০। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীহরিগুরু আশ্রম**।

(খ) স্থান ঃ বিলাইপুর, কাটলিছড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রী স্বরূপদাস ব্রজবাসী গোস্বামী। তিনি মধ্বাচার্য গোষ্ঠীর বৈষ্ণব। বর্তমানেও তিনি এই আখড়ার সেবায়েত।

(ঙ) উৎসব ঃ বৈষ্ণবধর্মে প্রচলিত সব অনুষ্ঠানই এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

৪১। (ক) আখড়ার নাম ঃ **বড়মুন্সী আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ বিলাইপুর, কাটলিছড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রী সর্বানন্দ ব্রজবাসী গোস্বামী।

(ঙ) উৎসব ঃ এই আখড়ায় বৈষ্ণবধর্মে প্রচলিত সবই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষত ঝুলন, নিয়ম মাস, দোলযাত্রা ইত্যাদি।

৪২। (ক) আখড়ার নাম ঃ **ছোটোমুন্সীর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ বিলাইপুর, কাটলিছড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ অজ্ঞাত।

(ঙ) উৎসব ঃ গ্রামবাসীরা মিলেমিশে সবই অনুষ্ঠান পালন করেন।

৪৩। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ ধলছড়া, কাটলিছড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র গোস্বামী।

(ঙ) উৎসব ঃ এখানে বৈষ্ণব ধর্মের সবই অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

৪৪। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মার্গনপুর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ মার্গনপুর বাগান, আলগাপুর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীশ্রীধর্মদাস বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখ্য ধর্মদাস বাবাজি সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণব হয়েছিলেন। সংসারধর্মে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে সুখে ও আনন্দে দিনযাপন করছিলেন। কিন্তু কোনো এক দৈববাণীতে বিশ্বাসী হয়ে স্বামী-স্ত্রী সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর মধ্যে ছিল প্রকৃত বৈষ্ণবীয় গুণ। জাঁকজমকতা কোনোদিন ছিল না। সাধারণ সাদা কাপড় পরিধান করে থাকতেন। পায়ে কোনোদিন জুতো বা চপ্পল পরেননি। তিনি ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ এ শক্তি অনুধাবন করতে পারেনি। যারা তাঁর খুববেশি সহযোগী ছিল তাদের মধ্যে দু-একজন অনুধাবন করতে পেরেছে। যাই হোক তাঁর দেহত্যাগের পর আখড়াটি বন্ধ হয়ে যায়।

জেলা ঃ করিমগঞ্জ

৪৫। (ক) আখড়ার নাম ঃ **জগন্নাথ আশ্রম**।

(খ) স্থান ঃ চৈতন্য নগর (ঘোড়ামারা), করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ সিলেটের খাজাঞ্জি স্ট্যাট এর দানকৃত জমিতে এই আখড়া স্থাপিত হয়েছে।

(ঙ) স্থাপনকর্তা বা প্রথম বৈষ্ণব ঃ নাম জানা যায়নি।

(চ) বর্তমান বৈষ্ণব ঃ শ্রী জগতবন্ধু গোস্বামী।

(ছ) অনুষ্ঠান ঃ রথ, ঝুলনযাত্রা, নিয়ম মাস সহ সবই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বিশেষত প্রতিবৎসর পৌষ মাসের দশ তারিখ অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

৪৬। (ক) আখড়ার নাম ঃ **বলরাম আশ্রম**।

(খ) স্থান ঃ লালচক, দক্ষিণ করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৩৭৫ সাল (১৯৬৮ ইংরেজি)।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীশ্রীরামদয়াল ঠাকুর।

(ঙ) বর্তমান বৈষ্ণব ঃ পরমানন্দ বৈষ্ণব ও নয়ানতারা বৈষ্ণবী। তারা দুজনই মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের দীক্ষিত বৈষ্ণব।

(চ) উৎসব অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন নিয়মাবলী ঃ

(১) প্রতিবৎসর ১লা বৈশাখ নববর্ষ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে শিষ্যরা গুরুর কাছে দেহের খাজনা দেন।

(২) শ্রাবণ মাসে তিথি এবং বার অনুযায়ী বিশিষ্ট বৈষ্ণবগুরু প্রাণবল্লভ গোস্বামীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। এ ছাড়া দীপাবলী, মাঘ মাস কিংবা ফাল্গুন মাসে নাম-সংকীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

(৩) গুপ্তসেবা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়মানুসারে একমাত্র বৈষ্ণবই এই গুপ্তসেবায় যোগদান করতে পারেন। আবার সব বৈষ্ণব নয়; যারা এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব তাঁরাই একমাত্র যোগদান করবেন।

(৪) ভোগের রয়েছে নির্দিষ্ট নিয়ম। এই আখড়ায় যখন ভোগের রান্না করা হয় তখন অন্য কেউ এই রান্না দেখতে পারেন না। একমাত্র যে বৈষ্ণব ভোগ রান্না করবেন তিনিই দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করবেন। ভোগ নিবেদনের পর শিষ্যদেরকে ডাকা হয় ভোগের প্রসাদ খাওয়ার জন্য।

(৫) এই সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে শিষ্য কখনও গুরুর পা স্পর্শ করে প্রণাম করতে পারবেন না। আলাদা বা দূর থেকে দণ্ডবৎ করতে হয়। যদি অজান্তে কোনো শিষ্য তার গুরু বা বৈষ্ণবের পা বা শরীর স্পর্শ করে নেন তখন সঙ্গে সঙ্গে গুরুকে স্নান করতে হয়।

(৬) এই আশ্রমে বেশির ভাগ সময়ে ভোগে ফলমূল দেওয়া হয়। রান্না করা দ্রব্য (ভোগ) খুব কম দেওয়া হয়।

(৭) সাধারণভাবে সহজিয়া বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত রয়েছে কুঞ্জসেবা কিন্তু বলরাম আশ্রম বা এই শ্রেণির বৈষ্ণব সমাজে কুঞ্জ সেবার স্থান নেই। বিশেষত বলা যায়, রামদয়াল ঠাকুরের মতাদর্শী বৈষ্ণবসমাজ সাদা কাপড় পরিধান করেন।

(৮) এই রামদয়াল ঠাকুরের আখড়ায় সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এখানে চৈতন্য মহাপ্রভুর কোনো বিগ্রহ নাই। এই আশ্রমে রয়েছে রামদয়াল ঠাকুর, বলরাম ঠাকুর, কমলদাস ঠাকুর, রসিকদাস ঠাকুর ও প্রাণবল্লভ গোস্বামীর পাদুকা। রাধা-কৃষ্ণের কিংবা চৈতন্যদেবের কোনো ভজন কীর্তন এই সম্প্রদায়ের আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় না। গুরুদের পাদুকা পুজোই একমাত্র নিয়ম। এই সম্প্রদায়ের শিষ্যদের বিশ্বাস গুরুদের স্মরণ নিলেই রাধা-কৃষ্ণের স্মরণ নেওয়াই হয়।

(৯) চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে রামদয়াল ঠাকুরের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোনো মিল নেই। তারা নিজেরা বৈষ্ণব বলে স্বীকার করলেও এই সম্প্রদায় বৈষ্ণবভুক্ত কী না সন্দেহ থেকে যায়।

৪৭। (ক) আখড়ার নাম ঃ **পঞ্চবটী আখড়া বা ব্রহ্মানন্দ জিউর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ বরকতপুর (জাতকাপন), করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ বৈষ্ণব।

(ঙ) নামকরণ ঃ পঞ্চবটী আখড়া নামকরণের কারণ হল যে একই রীতিনীতি মেনে পাঁচটি আখড়া পরিচালিত হয়। এই পাঁচটি আখড়া হল— (১) ব্রহ্মানন্দ জিউর আখড়া; (২) চূড়াদীঘিরপার আখড়া (নীলামবাজার); (৩) ঘাটুধরমপার আখড়া (দত্তপুর); (৪) ঠাকুর ভগবানের আখড়া (জাতকাপন); (৫) বলরাম আশ্রম (লালচক)। স্থানীয় জনসাধারণের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে উল্লিখিত অন্য চারটি আখড়ার প্রতিষ্ঠাপকরা একসময় এই আখড়ায় একত্রিতভাবে বসবাস করেছিলেন। আর এ জন্যই এই আখড়ার নামকরণ হয়েছে পঞ্চবটী আখড়া।

(চ) ইতিহাস ঃ এই আখড়ায় রয়েছে প্রচুর সমাধি। সমাধির পরিবেশ দেখলেই বুঝা যায় আখড়াটি কত পুরানো। প্রায় ৩০টির সমাধি বিদ্যমান। বর্তমানে কোনো বৈষ্ণব এই আখড়ায় স্থায়ীভাবে থাকতে পারেন না। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস অনাচার, অনিয়মের ফলে কেউ থাকতে পারেন না। জীবনদাস বৈষ্ণব-ই ছিলেন এই আখড়ায় শেষ স্থায়ী বৈষ্ণব। বর্তমানে পরিচালন সমিতি আখড়াটির দেখাশুনা করেন। এখানে উল্লেখ্য, বলরাম আশ্রমের রীতিনীতি ও নিয়মকানুন এখানেও প্রযোজ্য।

৪৮। (ক) আখড়ার নাম ঃ **ঠাকুর ভগবানের আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ বরকতপুর (জাতকাপন), করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীশ্রীরাধাচরণ বৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ রঙ্গদেবী বৈষ্ণবী।

৪৯। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীগোপালের আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ আমবাড়ি (চরগোলা), করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১০০-১২০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ সাহেব রাম।

(ঙ) প্রতিষ্ঠাতা ঃ নাম জানা যায়নি।

(চ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী ভক্তদাস গোস্বামী ও হরিপ্রিয়া গোস্বামী।

(ছ) উৎসব অনুষ্ঠান ঃ ঝুলন, রথযাত্রা, কার্তিক মাসে মঙ্গলা মাস উৎসব পালন সহ বৈষ্ণবধর্মে প্রচলিত সবই অনুষ্ঠান এই আখড়ায় পালন করা হয়। বিশেষভাবে বৎসরে একবার নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। তবে নির্দিষ্ট কোনো মাস কিংবা তারিখে অনুষ্ঠিত হয় না। ভক্তবৃন্দের সুবিধা অনুযায়ী তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়।

৫০। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীধর্মচাঁদ দাস বৈষ্ণব ঠাকুরের আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ নাইরগ্রাম (চরগোলা), করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৮৬৮ ইংরেজি (১২৭৫ বঙ্গাব্দ)।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ যাদব নাথ।

(ঙ) প্রথম বৈষ্ণব ঃ শচীনন্দন বৈষ্ণব।

(চ) বর্তমান বৈষ্ণব ঃ ধর্মচাঁদ দাস বৈষ্ণব।

(ছ) অনুষ্ঠান/উৎসব ঃ এখানে বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে বিজড়িত সবধরনের উৎসব/অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বিশেষত রথযাত্রা, ঝুলন ইত্যাদি। এখানে উল্লেখনীয়, এই আখড়াটি সৎনামী সম্প্রদায়ের আখড়া।

৫১। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীজগন্নাথ আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ নন্দপুর (স্যুইজগ্যাট), বদরপুর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৯০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রথম বৈষ্ণব ঃ নবীন দাস বৈষ্ণব।

(ঙ) অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়ায় বৈষ্ণব ধর্ম সংশ্লিষ্ট সবই অনুষ্ঠান বা নিয়ম পালন করা হয়। এ ছাড়া প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে উদয়-অস্ত নামকীর্তন হয়।

৫২। (ক) আখড়ার নাম ঃ **জগন্নাথ জিউর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ ভাঙ্গা, করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাতা বৈষ্ণব ঃ গোপাল দাস বৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রীআনন্দ দাস বৈষ্ণব ও সুরধনী দাস বৈষ্ণব।

(চ) আখড়ার নিয়মনীতি ঃ এই আখড়ায় প্রতিদিন তিনবার ভোগ দেওয়া হয়। সকালবেলা দেওয়া হয় বাল্যভোগ, দুপুরে রাজভোগ এবং রাত্রে ফলভোগ দেওয়া হয়।

(ছ) উৎসব অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়ায় যেসব উৎসব অনুষ্ঠান পালিত হয় সেগুলি হল ঝুলন, দোল উৎসব, নিয়ম মাস, রথযাত্রা ইত্যাদি। এ ছাড়া প্রতিবৎসব অগ্রহায়ন মাসের সাত তারিখ নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

৫৩। (ক) আখড়ার নাম ঃ **কৃষ্ণচন্দ্রের আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ মসকিপুর, বদরপুর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ জানা যায়নি।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণব ঃ শ্রীশ্রীমদনরাম বৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রীস্বরূপানন্দ বৈষ্ণব ও ললিতা বৈষ্ণবী। এরা দুজনই মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত।

(চ) এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের নীতিনিয়ম ঃ এই মধ্বাচার্যভুক্ত বৈষ্ণবেরা সর্বকেশী। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যেভাবে একবার মাথার চুল মুণ্ডন করে দীক্ষা নিয়েছিলেন তেমনি এই সর্বকেশীরা মাথার চুল ফেলে দীক্ষা নেয়। আবার ভেক নেওয়ার সময় মাথার চুল মুণ্ডন করেন। এরপর আর মুণ্ডন করতে হয় না। এমনকী গোঁফ-দাঁড়িও কাটে না। এ ছাড়া এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা ৬৪ জন

মহন্তের আসন, ৮ জন কবিরাজ, ১২ জন গোপালের এবং পঞ্চতত্ত্বের আসন দেন। এই বৈষ্ণবেরা বিগ্রহের সঙ্গে শালগ্রাম নিয়ে থাকেন এবং তাঁরা কুঞ্জসেবাধারী।

(ছ) উৎসব ঃ বৈষ্ণব ধর্মের সব অনুষ্ঠানই এখানে পালন করা হয়।

৫৪। (ক) আখড়ার নাম ঃ **লালবাবার আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ নয়াপাথর (ভাঙ্গা), করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী দীনমণি বৈষ্ণবী।

(ঙ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ আখড়াকে কেন্দ্র করে প্রায় সবই অনুষ্ঠান, বিশেষকরে ঝুলন, নিয়ম মাস ইত্যাদি জাঁকজমকভাবে পালন করা হয়।

৫৫। (ক) আখড়ার নাম ঃ **জগন্নাথ মহাপ্রভুর মন্দির**।

(খ) স্থান ঃ চৈতন্য নগর (মালুয়া), করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ প্রথম বৈষ্ণবের নাম অজ্ঞাত। তার পরবর্তী সময়ে বনমালী দাস বৈষ্ণবের সময় থেকে প্রত্যেকের নাম তালিকায় রয়েছে।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী গোবিন্দ দাস বাবাজি ও রসপ্রিয়া বৈষ্ণবী। এখানে উল্লেখনীয় রসপ্রিয়া বৈষ্ণবী হলেন শ্রী গোবিন্দ দাস বৈষ্ণবের ভেকের শিষ্য। তাঁরা মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত ও গৃহস্থী বৈষ্ণব।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়ায় যেসব উৎসব পালিত হয়, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল— রথ (আষাড় মাসে), নিয়ম সেবা (কার্তিক মাসে), জন্মাষ্টমী ও দোল। এ ছাড়া রয়েছে ফাল্গুন মাসে 'গোপীকীর্তন'। এই নামকীর্তন উদয়াস্ত সময় পর্যন্ত চলে।

৫৬। (ক) আখড়ার নাম ঃ **সুভারাম আশ্রম**।

(খ) স্থান ঃ মালুয়া, করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ খুব সম্ভব সুভারাম নামে কোনো বৈষ্ণব বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এখানে আশ্রম তৈরি করেছিলেন। আর, তারই নামানুসারে এই আশ্রমের নাম হয়েছে 'সুভারাম আশ্রম'। তবে গ্রামবাসী সঠিকভাবে কিছু বলতে পারেননি। আবার তাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস, সুভারামের আশীর্বাদে গ্রামের প্রত্যেকেরই মঙ্গল হয়। এ ছাড়া গ্রামের কোনো অনুষ্ঠানের প্রথমে সুভারামের কাছে মানত করা হয়। এবং গ্রামে বৈষ্ণবসেবা বা এ ধরনের কোনো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলে প্রথমে এখানে ভোগ দেওয়া হয়। আর এই ভোগ দেওয়া হয় কোনো বৈষ্ণবের মাধ্যমে; ব্রাহ্মণ দিয়ে নয়। এ ছাড়া এই আশ্রমে প্রতি বৈশাখ মাসে অষ্টপ্রহর কীর্তন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানও পালন করা হয়।

৫৭। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ মালুয়া, বদরপুর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৩৬৫ সাল (ইংরেজি ১৯৫৮)।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীভগবান দাস বৈষ্ণব ও নির্মলা দাস বৈষ্ণবী।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ সুচিত্রা বৈষ্ণব।

(চ) অনুষ্ঠান ঃ ঝুলন, দোলযাত্রা, নিয়ম মাস, রথযাত্রা (আষাঢ় মাসে) সহ অন্যান্য সব অনুষ্ঠানই এখানে পালন করা হয়।

৫৮। (ক) আখড়ার নাম ঃ **গোপাল আখড়া বা দয়ানন্দের আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ শ্রীগৌরী, বদরপুর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ২২ জৈষ্ঠ্য ১৩২২ বঙ্গাব্দ (ইং ১৯১৫)।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীজয়দেব বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখ্য, জয়দেব বৈষ্ণবের পরে যথাক্রমে নরোত্তম বৈষ্ণব ও দয়ানন্দ বৈষ্ণব এই আখড়ার সেবায়েত হিসেবে ছিলেন।

(ঙ) বর্তমান বৈষ্ণব বা সেবায়েত ঃ শ্রী কল্যাণজ্যোতি ভট্টাচার্য। তিনি আখড়ায় কৃষ্ণসেবা করলেও

ব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাসী। কৃষ্ণ ভজনার সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করেন। এখানে উল্লেখ্য, চৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্মে ব্রাহ্মণ্যবাদের কোনো স্থান নেই। যাই হোক, তিনি গৃহস্থী বৈষ্ণব।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়ায় রথযাত্রা, মঙ্গলারতি সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

৫৯। (ক) আখড়ার নাম ঃ **নীরদা আশ্রম**।

(খ) স্থান ঃ শ্রীগৌরী, বদরপুর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১৮০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীশ্রীসুবল দাস বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখনীয়, সুবল দাস বৈষ্ণবের পূর্বনাম অর্থাৎ বৈষ্ণব (ভেক) নেওয়ার পূর্বে শ্রী সুবোধ দাস নামে পরিচিত ছিলেন।

(ঙ) বর্তমান বৈষ্ণব ঃ শ্রী রামদাস বৈষ্ণব। তিনি মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণব ধর্মমতের সব অনুষ্ঠান এখানে পালন করা হয়।

৬০। (ক) আখড়ার নাম ঃ **গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ শ্রীগৌরী, বদরপুর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৯০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ রমেশ দাস (প্রাক্তন বিধায়ক)।

(ঙ) প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণব ঃ বাবুল দাস বৈষ্ণব।

(চ) বর্তমান বৈষ্ণব ঃ দীনবন্ধু দাস বৈষ্ণব ও বনমালা বৈষ্ণবী। তাঁরা উভয়ই মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(ছ) উৎসব/অনুষ্ঠান ঃ এখানে বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে জড়িত সব অনুষ্ঠানই পালন করা হয়। বিশেষত প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের ২০ তারিখ অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

৬১। (ক) আখড়ার নাম ঃ **গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগন্নাথের আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ ওমরপুর, বদরপুর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ জানা যায়নি।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ অজ্ঞাত। স্থানীয় জনসাধারণ সঠিক তথ্য দিতে পারেননি।

(ঙ) বর্তমান বৈষ্ণব ঃ বৃন্দাপাল বৈষ্ণব ও তন্দ্রাপাল বৈষ্ণবী।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়ায় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে জড়িত সব অনুষ্ঠানই পালন করা হয়।

৬২। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীনরসিংহ প্রভুর মন্দির।**

(খ) স্থান ঃ সজপুর (ফকিরাবাজার), করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ ধর্মদাস বৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান বৈষ্ণব ঃ কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব।

(চ) আখড়াটির ইতিহাস ঃ একসময়ই এই সজপুর অঞ্চলটি ছিল হিন্দু বসতিপ্রধান। কিন্তু কালের প্রবাহে ধীরে ধীরে গ্রামটি হিন্দুশূন্য হতে থাকে। এর প্রধান কারণ, গ্রামটি বর্তমান বাংলাদেশের সীমানাবর্তী এলাকায় পড়েছে। তাছাড়া হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা এর একটি মূল কারণ। বর্তমানে এই আখড়া ছাড়া গ্রামটিতে কোনো হিন্দু মানুষ নেই। ফলে একদিন হয়তো এই আখড়াটিও হিন্দুদের হাতছাড়া হবে বলে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

এই আখড়ায় প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত যত বৈষ্ণব বা বাবাজি থেকেছেন তাঁরা সবাই অবিবাহিত। সঙ্গী কোনো বৈষ্ণবী নিয়ে থাকতেন না। মহাপ্রভু যেভাবে একাঙ্গী ছিলেন ঠিক তেমনি এই বৈষ্ণবেরাও ছিলেন একাঙ্গী। বর্তমান বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস বাবাজিও একা এই আখড়ার দেখাশুনা কারণ। বৃহৎ হিন্দুশূন্য এলাকায় এই আখড়াটি আজও বর্তমান।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠান ঃ আখড়া থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস। তারা সময়ে সময়ে আখড়ায় গিয়ে ভজন কীর্তন করেন। সেইসঙ্গে প্রত্যেকের সাধ্যানুযায়ী আখড়ার নামে দান করেন। তবে প্রতিদিন বৈষ্ণব বাবাজি ভোগ ও অন্যান্য নিয়মনীতি যতটুকু সম্ভব পালন করে থাকেন।

৬৩। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ সাদারাশি, করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণব ঃ শ্রীশ্রীদীনবন্ধু বৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান বৈষ্ণব ঃ দেবদাস বৈষ্ণব ও বিষ্ণুপ্রিয়া বৈষ্ণবী। উভয়ই মধ্ব্যাচার্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে তাঁরা দীক্ষিত।

(চ) অনুষ্ঠান ও উৎসব ঃ বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে জড়িত সব অনুষ্ঠানই এই আখড়ায় পালন করা হয়। তবে বিশেষভাবে 'অন্নকূট' অনুষ্ঠান ধুমধামে পালন করা হয়। এই 'অন্নকূট' বা 'গোবর্ধন' উৎসবের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে। এই নিময়গুরি হল— ১০৮ ধরণের সব্‌জিদিয়ে ১০৮টি তরকারি রান্না করতে হয়। তারপর কৃষ্ণ কিংবা মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করা হয়। শেষ পর্যায়ে সবধরণের তরকারি সহযোগে মিশ্রিত প্রসাদ তৈরি করে শিষ্যদেরকে দেওয়ার রীতি রয়েছে। সেইসঙ্গে এদিনেই 'অন্নকূট' উৎসবের পরে নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

৬৪। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ ওমরপুর (শ্রীগৌরী), বদরপুর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাতা বৈষ্ণব ঃ সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত বা বৈষ্ণব ঃ বৃন্দাদাস বৈষ্ণবী।

(চ) এই আখড়ায় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে জড়িত সব অনুষ্ঠানই পালন করা হয়। তবে বিশেষভাবে ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার সময় অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত হয়।

৬৫। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীঠাকুরবাণী জয়তু আখড়া (রাধাগোবিন্দ আশ্রম)।**

(খ) স্থান ঃ ওমরপুর (শ্রীগৌরী), বদরপুর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ নাম জানা যায়নি।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী কমলা গোস্বামী (গৃহস্থী বৈষ্ণব)। তিনি মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত।

(চ) শ্রীশ্রীঠাকুরবাণী আখড়ার ইতিহাস ও নিয়মাবলী ঃ শ্রীশ্রীঠাকুরবাণী চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের নীতিনিয়ম থেকে একটু আলাদা। ঠাকুরবাণীর জন্মস্থান হল বাংলাদেশের দিনারপুরের শতকগ্রামে । এই অঞ্চলটি পড়েছে হবিগঞ্জ জেলায়। তাঁর পিতার নাম শ্রীহরিশচন্দ্র গোস্বামী। তিনিও গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিলেন।

লোকমুখে প্রচলিত, একদিন ইসলামধর্মী লোকেরা (নবাব শাসনের সময়) ঠাকুরের ভোগ হিসেবে গোমাংস দিতে বাধ্য করে। উপায়হীন হয়ে ঠাকুরবাণী তাদের কথা মেনে নেন। কিন্তু মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে থাকেন এই বিবাদ থেকে উদ্ধার করার জন্য। ঠাকুরাণীর ডাকে সাড়া দেন পরমাত্মা ঈশ্বর। অলৌকিকভাবে গোমাংস সুস্বাদু মিস্টিতে পরিণত হয়। উপস্থিত প্রত্যেকেই আশ্চর্য হল। সেদিন থেকেই ঠাকুরবাণীর পুজো-অর্চনায় ধর্মান্ধ ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা আর কোনো বাধা আরোপ করেনি।

ঠাকুরবাণীর আরেকটি অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা লোকের মুখে মুখে প্রচলিত। সেটি হল, আগুনে সিদ্ধ তেঁতুলের গুটি (বীচি) থেকে একদিনে গাছ বড় হয়ে তেঁতুল ধরা। যাই হোক, সেই তেঁতুল গাছের তেঁতুল ঠাকুরবাণী সানন্দে ভক্ষণ করেন। এ ধরনের অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের কথা লোকমুখে প্রচলিত।

ঠাকুরবাণীর দীক্ষায় দীক্ষিত বৈষ্ণবেরা জাতপাতে বিশ্বাসী। তারা শুধু ব্রাহ্মণের হাতে রান্না খেয়ে থাকেন। অব্রাহ্মণদের হাতের রান্না ওদের কাছে অস্পৃশ্য। বিশেষত বলা যায়, এই সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। মহাপ্রভুর মতামত থেকে তাদের অবস্থান শতযোজন দূরে। এই সম্প্রদায়ের অনেকেই গৌড়ীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী। এখানে উল্লেখনীয়, কোনো অব্রাহ্মণ ব্যক্তিকে ওরা অর্থাৎ ঠাকুরবাণীর শিষ্য কোনো কিছু দিতে হলে সেই অব্রাহ্মণকে স্পর্শ না-করে ঢিল মেরে দেন। বিশেষত ঠাকুরবাণীর প্রত্যেক শিষ্যরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের মানসিকতা এখনও সংকীর্ণ। জাতপাতের ঊর্ধে উঠতে না-পারায় তাঁদেরকে বৈষ্ণব বলা যায় কীনা-তা

সন্দেহের বিষয়। তবে একথাও বিচার্য বিষয়, স্বয়ং ঠাকুরবাণী এরকম ছিলেন কিনা? তিনি হয়তো জাতপাতের ঊর্ধে ছিলেন। যাই হোক, এই আশ্রমে ঝুলন, দোল-এসব অনুষ্ঠান ছাড়াও চৈত্র মাসে নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

৬৬। (ক) আখড়ার নাম ঃ **রাধাগোবিন্দ মন্দির**।

(খ) স্থান ঃ বদরপুর বাজার।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের (বঙ্গাব্দ ১৩৮৫) অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এই আখড়াটি স্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠা বৈষ্ণব ঃ শ্রীশ্রীহরিপদ বৈষ্ণব (গোস্বামী)।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রীভক্তিভূষণ গোস্বামী। তিনি মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব।

(চ) অনুষ্ঠান/উৎসব ঃ এই আখড়ায় বৈষ্ণব ধর্মের সন্নিবেশিত প্রায় সব অনুষ্ঠানই পালিত হয়। তবে সাধ্যানুসারে অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বেশি জাঁকজমকভাবে পালিত হয় না।

৬৭। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ রাধামাধব কলোনী, বদরপুর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৭৬ ইংরেজির (১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এই আখড়াটি স্থাপন করা হয়।

(ঘ) প্রথম বৈষ্ণব বা প্রতিষ্ঠাপক ঃ সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ রঘুনন্দন দাস বৈষ্ণব ও রাসেশ্বরী দাস বৈষ্ণবী। উভয়ই মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(চ) উৎসব/অনুষ্ঠান ঃ এখানে বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে জড়িত সব অনুষ্ঠানই পালন করা হয়। বিশেষত দোল, ঝুলন, নিয়ম মাস সহ সব অনুষ্ঠানই জাঁকজমকভাবে পালন করা হয়। তবে বিশেষভাবে অগ্রহায়ণ মাসে 'অন্নকূট' উৎসব পালন করা হয়। সেই সঙ্গে প্রতিবৎসর নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

৬৮। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জিউর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ কালাইরবন্দ, বদরপুর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ দয়ালরাম মালাকার।

(ঙ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীরতন দাস বৈষ্ণব।

(চ) বর্তমান বৈষ্ণব ঃ বনমালী দাস গোস্বামী।

(ছ) বর্তমান আখড়ার পরিচালন সমিতি ঃ সভাপতি— মিণ্টু মালাকার; সম্পাদক— সুখেশ মালাকার।

(জ) আখড়ার অবদান ঃ কালাইরবন্দ গ্রামটি 'মালাকার' অধ্যুষিত এলাকা। একসময় পুরো গ্রামটিতে 'মালাকার' সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। যাই হোক, এই গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি দয়ালরাম মালাকার আখড়া স্থাপনের জন্য ভূমি দান করেন এবং সেখানে এই আখড়া স্থাপন করেন শ্রীশ্রীরতন দাস বৈষ্ণব। এই রতন দাস বৈষ্ণব ছিলেন কালাইরবন্দ গ্রামের শিক্ষার দূত। তিনি শুধু একজন বৈষ্ণব ছিলেন না; ছিলেন একজন প্রকৃত শিক্ষকও। তবে তিনি সরকারী মাইনে প্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন না। মহাপ্রভুর সেবা-অর্চনার পর অবসর সময়ে পাড়ার কচিকাঁচাদের পড়াতেন। তাঁর হাতেই হাতেখড়ি হয় সেই সময়ের পাড়ার শিশু সমাজের। তিনিই প্রথম এই গ্রামে শিক্ষার আলো দেখান। এরপরই ১৯৩৭ সনে কালাইরবন্দ প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হয়।

(ঝ) উৎসব/অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মে প্রচলিত সবই অনুষ্ঠান এই আখড়ায় পালন করা হয়। বিশেষত ঝুলন, দোল, রথযাত্রা ও নিয়মমাস— এসব মহাধুমধামে পালন করা হয়। এ ছাড়া গতবৎসর আখড়ার বৈষ্ণবী নিকুঞ্জলতা বৈষ্ণবীর দেহত্যাগের পর অষ্টপ্রহর নামকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

৬৯। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ দাঁড়ারপার (নিলামবাজার), করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ জমিদার কুমার বাহাদুর (পঞ্চখণ্ড)।

(ঙ) তথ্যদাতা ঃ শ্রীরঞ্জিত মালাকার ও ড° সর্বজিৎ দাস।

(চ) প্রতিষ্ঠাতা বৈষ্ণব ঃ প্রেমানন্দ দাস বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখনীয়, প্রেমানন্দ বৈষ্ণবের প্রাক্‌ভেকের নাম ছিল পুলিন মালাকার। তিনি তথ্যদাতা রঞ্জিত মালাকারের পূর্বপুরুষ ছিলেন।

(ছ) বর্তমান বৈষ্ণব ঃ শ্রী গোবিন্দ দাস বৈষ্ণব ও লবঙ্গ বৈষ্ণবী। তারা দুজনেই অদ্বৈত আচার্যের গোষ্ঠীবদ্ধ।

(জ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়ায় ঝুলন, রথযাত্রা সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

(ঝ) ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ঃ দাঁড়ারপার গ্রামের বর্তমান নাম 'বিদ্যানগর'। এই গ্রামটি পুরোপুরি হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল। এই গ্রামের বসবাসকারী জনসাধারণ প্রত্যেকেই আদিবাসিন্দা। তাই এখানকার মঠ-মন্দিরগুলি অতি প্রাচীন। এই গ্রামে রয়েছে দুটি আখড়া এবং একটি কালীমন্দির। গ্রামের প্রায় প্রত্যেকেই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হলেও শাক্তভক্ত একেবারেই কম নয়। এখানে উল্লেখনীয়, নিলামবাজার সংলগ্ন অঞ্চলের তৎকালীন জমিদার কুমার বাহাদুর মঠ-মন্দিরের জন্য প্রচুর জমি দান করেছিলেন।

৭০। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জিউর মন্দির**।

(খ) স্থান ঃ করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১৬০-১৬৫ পূর্বে এই আখড়া স্থাপিত হয়েছিল।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ নাম জানা যায়নি।

(ঙ) রাধামদনমোহন আখড়ার ইতিহাস ঃ ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে জানা যায়, আজ থেকে প্রায় ১৬০-১৬৫ বৎসর পূর্বে এই আখড়া স্থাপিত হয়েছিল। এই আখড়াটির পূর্বনাম ছিল 'রামাওয়েত আখড়া' বা 'রামায়তী আখড়া'। তা থেকে বুঝা যায় রামানুজ সম্প্রদায়ের কোনো বৈষ্ণব এই আখড়াটি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পুরো নাম জ্ঞাত নয়। যাই হোক, উত্তরপ্রদেশের রামানুজ সম্প্রদায়ের কিছু লোক এই আখড়ায় দেখাশুনা ও পুজো-অর্চনা করতেন। জনশ্রুতি অনুসারে এই আখড়াটির পরিচালনায় ছিলেন রামভজন চৌবে। তিনি আখড়ায় হনুমানের পুজো করতেন। চৌবে মহাশয়ের পরবর্তী আরও তিনপুরুষ এই মন্দিরের সেবায়েতের কাজ পরিচালনা করেছেন।

একসময় চৌবে পরিবার করিমগঞ্জ থেকে উত্তরপ্রদেশে স্থায়ীভাবে চলে যান। এখানে উল্লেখনীয়, সেই সময়ে হনুমানজীর পুজোর সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের যুগল স্বরূপের পুজো দেওয়া হত।

যাই হোক, চৌবে পরিবার করিমগঞ্জ থেকে চলে যাওয়ার পর এই আখড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। তাঁর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। আর, এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিলেন সর্বমোট চারজন। এখানে উল্লেখ্য, রামানুজ সম্প্রদায়ের দীক্ষিত চৌবের বংশধরেরা উত্তরপ্রদেশে চলে যাওয়ার প্রাক্‌মুহূর্তে জনাকয়েক বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে এই মন্দিরের দায়ভার সমর্পণ করেছিলেন। এই কমিটি দীর্ঘদিন আখড়া বা মন্দিরটি পরিচালনা করেন।

এই কমিটির পরবর্তী সময়ে বালাগঞ্জী ভূঁইঞারা আখড়াটি পরিচালনা করতেন। তবে তারা বেশিদিন আখড়াটি পরিচালনা করেননি। অবশেষে বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ এর ২ রা মাঘ শ্রীশ্রীমদনমোহনজীর মন্দির এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর এই সময়ে নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত আখড়াটিতে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও মধুসূদন সেন নিযুক্তি লাভ করেন। এরপর মন্দির পরিচালনার জন্য অনেক কমিটি গঠিত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে অনেকেই সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে যাঁদের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায় দিনের পর দিন মন্দিরের উন্নতি সাধিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রমোদবিহারী রায়, নবকুমার গোস্বামী, কৃষ্ণপদ দাস, ননীগোপাল বণিক, সুরেশচন্দ্র বণিক, মাখনলাল রায়, নিমাইচাঁদ সেন, নারায়ণ চন্দ্র দাস, শ্রীহরমোহন রায়, পবনাসারি গোস্বামী, রণেন্দ্রমোহন দাস, নিশিকান্ত সেন, নগেন দাস, লালমোহন ভূঁঞা, ঠাকুরদাস দাস, তারাপ্রসন্ন দাস ও গোবিন্দ দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা প্রত্যেকেই সুচারুভাবে আখড়া পরিচালনা করেছেন।

এ ছাড়া সেবায়েত বা বৈষ্ণব হিসেবে যারা এই মন্দির বা আখড়ায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন, রামভজন চৌবে, পবনাসারি গোস্বামী, রজনী চক্রবর্তী, ঘনশ্যাম ত্রিবেদী, ভজকৃষ্ণ ত্রিবেদী, রমাপদ ভট্টাচার্য মহাশয়। বর্তমানে সেবায়েতের কাজ পরিচালনা করছেন শ্রী নারায়ণ গোস্বামী মহাশয়। সেইসঙ্গে মন্দির পরিচালনা সমিতির বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদক হলেন যথাক্রমে শ্রী নিত্যানন্দ বণিক ও শ্রী শ্যামল রায় মহাশয়।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবীয় রীতিনীতি মেনে যেসব অনুষ্ঠান এই আখড়য় পালন করা হয় সেগুলি হল— মহানাম সংকীর্তন, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসলীলা, পঞ্চমদোল, হরিদাস নির্যাস, নিয়ম মাস পালন ইত্যাদি। এখানে উল্লেখনীয় নিয়ম মাস পালনের সময় পুরো মাসব্যাপী ভাগবত পাঠ ও কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

মহানাম সংকীর্তন— প্রথমাবস্থায় যোগেশ কর, অন্নদাপ্রসাদ বণিক ও কুলেন্দ্র ধর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের একান্ত প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন আরম্ভ হয়। পরবর্তী সময়ে অষ্টপ্রহর থেকে ষোলোপ্রহর কিংবা চব্বিশপ্রহর নামসংকীর্তনের প্রচলন হয়। বর্তমানে পনেরো দিন থেকে আঠারো দিন পর্যন্ত নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-বিদেশের নানাস্থান থেকে কীর্তনিয়া দল এসে নাম-সংকীর্তন গেয়ে থাকেন।

(ছ) শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান ঃ করিমগঞ্জের শহরাঞ্চলে যেসব আখড়া রয়েছে সেগুলির মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে এই শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জিউর আখড়ার অবদান অনস্বীকার্য। বৈষ্ণবীয় ধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের জ্ঞানের আলো থেকে পিছিয়ে পড়া কচিকাচা শিশুদের জ্ঞানের আলো সন্ধান দেওয়ার জন্য মন্দির পরিচালনা সমিতি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীমদনমোহন পাঠশালা স্থাপন করেন। এই পাঠশালাটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন 'গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডার' এর কর্ণধার। 'গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডার' নিজ ব্যয়ে মোহন্তলাল দত্ত বণিক মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই পাঠশালার গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এমনকী পরিচালনা কমিটি বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদেরকে নিজেদের তরফ থেকে এককালীন বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে।

(জ) অন্যান্য অবদান ঃ

(১) নাটমন্দির— ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে নিশিকান্ত সেন মহাশয় তাঁর মা-বাবার স্মৃতি রক্ষার্থে এই মন্দিরের নাটমন্দির তৈরি করে দেন। আর এই নাটমন্দিরে সবধরনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

(২) ১৩৬১ বঙ্গাব্দের ১০ জৈষ্ঠ্য মন্দিরে হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইসঙ্গে একটি 'বৈষ্ণবীয় গ্রন্থাগার' এই মন্দিরে স্থাপন করা হয়। বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কিত নানা মূল্যবান গ্রন্থ এই গ্রন্থাগারে

সংরক্ষিত। এখানে উল্লেখনীয়, মহন্তলাল দত্ত বণিক এই গ্রন্থাগারটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। বর্তমানে এই আখড়ায় এক সুরম্য ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।

৭১। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ বনমালী রোড, করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৫ ই আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ শ্রী যামিনী মালাকার ও কামিনী মালাকার।

(ঙ) তথ্যদাতা ঃ শ্রী বিশ্বজিৎ দাস।

(চ) প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণব ঃ অনন্ত দাস বৈষ্ণব।

(ছ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী নরহরি ব্রজবাসী গোস্বামী ও সুমনা বৈষ্ণবী।

(জ) আখড়াটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও উৎসব অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়াটির এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, যেদিন আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে সেইদিনই এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে। এখানে উল্লেখনীয় ১৪-ই আগস্ট করিমগঞ্জে পাকিস্থানের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। এরপর আবার ১৫-ই আগস্ট দ্বিতীয়বার ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

(ঝ) উৎসব ঃ এই আখড়ায় অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে 'ঝুলনযাত্রা' মহাধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয়। সেইসঙ্গে নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণিমার দিন এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছিল। এইদিনই আখড়াটির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।

৭২। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীভগবান গোপালবাবার আশ্রম**।

(খ) স্থান ঃ বনমালী রোড, করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ মৃণাল চৌধুরী ও অণিমা চৌধুরী। তাঁরা দুজনই ছিলেন শ্রীশ্রীরাধারমণ ঠাকুরের শিষ্য।

(ঙ) উৎসব ও অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়ায় বৈষ্ণব ধর্মের সব অনুষ্ঠানই পালন করা হয়। বিশেষভাবে জন্মাষ্টমী, রাধারমণের উৎসব এবং অণিমা চৌধুরীর তিরোধান তিথি (৩২ শে আষাঢ়, ১৪২০) পালন করা হয়।

(চ) আখড়ার নীতিনিয়ম ঃ অস্পৃশ্যতা এই আখড়ায় প্রচলিত। বিশেষ করে বলা যায়, যারা সেবায়েতের কাজে নিয়োজিত তারা কখনও ভক্তকে স্পর্শ করে প্রসাদ দেন না। প্রসাদ দেওয়ার সময় তারা কখনও ভক্তের হাত স্পর্শ করেন না। এমনকী আখড়ার চার সীমার বাইরে গেলে সেবায়েতরা স্নান করে ঘরে আসতে হবে। তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম থেকে এই আখড়ার নীতিনিয়ম একটু আলাদা বলে আমাদের মনে হয়। কারণ, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব অস্পৃশ্যতার ঊর্ধে ছিলেন।

এই আশ্রমে গোপালবাবার উদ্দেশ্যে পাঁচবার ভোগ দেওয়া হয়। এ ছাড়া আশ্রমে অনুষ্ঠিত কোনো অনুষ্ঠানে চাঁদা সংগ্রহ করা হয় না।

৭৩। (ক) আখড়ার নাম ঃ **রাধারমণ জিউর আশ্রম**।

(খ) স্থান ঃ দক্ষিণ বদরপুর, বদরপুর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীশ্রীরাধেশ্যাম বাবাজি।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ সীতারাণি দাস।

(চ) উৎসব ঃ বৈষ্ণব ধর্মের সব অনুষ্ঠান যেমন পালন করা হয় তেমনি প্রতিমাসে কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া দুর্গোপুজো, ঝুলন, রাধারমণ উৎসব ও বাসন্তী পুজো ইত্যাদি উৎসব পালন করা হয়। বিশেষভাবে বলা যায়, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয় যেন ঘটেছে এই আখড়ায়।

৭৪। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীগোপাল জিউ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জিউর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ বালিছড়া, রামকৃষ্ণনগর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীশ্রীচম্পকা বৈষ্ণবী ও প্রেমলতা বৈষ্ণবী।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী ধনঞ্জয় দাস বৈষ্ণব ও সুরধনী বৈষ্ণবী। এখানে উল্লেখনীয়, শ্রী ধনঞ্জয় দাস বৈষ্ণবের ভেকপূর্ব নাম ছিল শ্রী অজিত নন্দী। যাই হোক, তারা দুজনই মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত ও উদাসী বৈষ্ণব।

(চ) উৎসব ঃ এই আখড়ায় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে জড়িত সব অনুষ্ঠানই পালন করা হয়। বিশেষভাবে প্রতিবৎসর ৬ই ফাল্গুন অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

৭৫। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মনআলা আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ বাজারঘাট, রাতাবাড়ি।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়েছে এই আখড়াটি।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ প্রতিষ্ঠাতা বৈষ্ণবের নাম জানা যায়নি।

(ঙ) ভূমিদাতা ঃ জমিদার কুমার বাহাদুর এই আখড়ার জন্য জমি দান করেছিলেন।

(চ) বর্তমান সেবায়েত ঃ নাম অজ্ঞাত।

৭৬। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মাঝেরপার আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ রামকৃষ্ণনগর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৭০-৮০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীপ্রাণগোপাল বৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ নাম অজ্ঞাত।

৭৭। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ দক্ষিণ কালাচুব, রামকৃষ্ণনগর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ জমিদার কুমার বাহাদুর।

(ঙ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীশ্রীবলরাম দাস বৈষ্ণব।

(চ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী কৃষ্ণগোপাল দাস বৈষ্ণব ও বিষ্ণুপ্রিয়া বৈষ্ণবী। তাঁরা দুজনই মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত ও উদাসী বৈষ্ণব।

(ছ) উৎসব ঃ বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে জড়িত সব ধরনের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বিশেষত পৌষ মাসের ২২ তারিখ প্রতিবৎসর নামকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের সাত তারিখ যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়।

৭৮। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ মাঝের টিলা (দক্ষিণ কালাচুব), রামকৃষ্ণনগর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ তুলসীদাস বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখনীয়, তুলসীদাস বাবাজি বৈষ্ণব দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়ার পূর্বেই তার পুরো ধন-সম্পত্তি শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ সেবায় অর্পণ করে দিয়েছেন। এরপর তাঁর পূর্বের বাড়িতেই আখড়া স্থাপন করেন। তুলসী দাস বাবাজির পূর্বনাম ছিল প্রাণগোপাল দাস।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ মাধবদাস বৈষ্ণব। তিনি মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত।

(চ) উৎসব অনুষ্ঠান ঃ ঝুলন, নিয়ম মাস, রথযাত্রা, দোল সহ বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে জড়িত সবই অনুষ্ঠান এখানে পালন করা হয়।

৭৯। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ বরুয়ালাবাড়ি, রামকৃষ্ণনগর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় একশত বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়েছে এই আখড়াটি।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ কমলনাথ বৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ সুদাম দাস বৈষ্ণব ও কুঞ্জলতা বৈষ্ণবী। এই দুজনই সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং উদাসী বৈষ্ণব।

(চ) আখড়াটি সম্পর্কে দু-চার কথা ঃ স্থাপনকর্তা কমলনাথ বাবাজি নিজের পুরো সম্পত্তি আখড়ার নামে দান করেছিলেন। দান করে তিনি গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হল। গৃহত্যাগ করলেও পূর্ব নিজভূমিতে আখড়া স্থাপন করে উদাসী জীবনযাপন করতে থাকেন। কালের নিয়মানুযায়ী তিনি দেহত্যাগ করার পর স্বার্থান্বেষী প্রতিবেশীরা আখড়ার জমিজমা দখল করার ফন্দি করেন। কোনো বৈষ্ণব এখানে থাকতে আসলে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে কালের প্রবাহে আখড়ার জমিজমা প্রায় হাতছাড়া হয়েছে। কিছু স্থানীয় জনসাধারণ আখড়ার সম্পত্তি এভাবে বিনষ্টি হওয়ার ফলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

(ছ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ নামমাত্রভাবে বৈষ্ণব রীতি অনুসারে আখড়ায় উৎসব পালন করা হয়ে থাকে।

৮০। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ উত্তর কালচুব, রামকৃষ্ণনগর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত দাস বৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ বর্তমানে একজন বৈষ্ণবী আখড়ার সেবায়েত হিসেবে রয়েছেন। তাঁর নাম জানা যায়নি। কারণ তিনি কথা বলতে পারেন না। এমনকী লেখাও জানেন না। তাই তাঁর নামটি অজ্ঞাত রয়েছে।

(চ) আখড়াটি নিয়ে দু-চার কথা ঃ এই আখড়ারও প্রচুর জমিজমা ছিল। প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণব নিজের সম্পত্তির কিছু অংশ আখড়ার নামে দান করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রবাহে এসব জমিজমা হাতছাড়া হয়েছে। উৎপন্ন ফসলের ভাগ এখন আর কেউ আখড়ায় দেন না।

(ছ) অনুষ্ঠান ঃ প্রায় সব অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

৮১। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ সিঙ্গিরপার, দক্ষিণ করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ নদীয়া মালাকার ও শহর মালাকার। এই দুই ভাই আখড়ার জন্য জমি দান করেছিলেন। এখানে উল্লেখনীয় নদীয়া মালাকার বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভেক ধারণ করেছিলেন।

(ঙ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ নন্দলাল বৈষ্ণব। এই নন্দলাল বৈষ্ণবের পূর্বনাম ছিল নদীয়া মালাকার।

(চ) বর্তমান সেবায়েত ঃ প্রাণকৃষ্ণ দাস বৈষ্ণব ও রসপ্রিয়া বৈষ্ণবী। তাঁরা উভয়েই অদ্বৈতাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সহজিয়া উদাসী বৈষ্ণব। তারা রাত্রে মাছস্পর্শ করেন।

(ছ) উৎসব অনুষ্ঠান ঃ ঝুলন, দোলযাত্রা, নিয়ম মাস, রথযাত্রা সহ বৈষ্ণব ধর্মে পালনীয় সব অনুষ্ঠানই এই আখড়ায় পালন করা হয়। বিশেষভাবে প্রতিবৎসর মাঘ মাসের দুই তারিখ নামসংকীর্তন (অষ্টপ্রহর) অনুষ্ঠিত হয়।

৮২। (ক) আখড়ার নাম ঃ **নিতাই মহাপ্রভুর বড় আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ আসনপুর (হাসানপুর), শ্রীগৌরী।

(গ) স্থাপনকাল ঃ আনুমানিক ২৫০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ জমিদার শান্তরাম ও উল্লাসরাম পুরকায়েতের দাতকৃত জমিতে এই আখড়া নির্মিত হয়েছে।

(ঙ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীচৈতন্যদাস বৈষ্ণব।

(চ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী নরহরি দাস বৈষ্ণব ও সুখমণি দাস বৈষ্ণবী। তাঁরা অদ্বৈত সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব।

(ছ) উৎসব ঃ বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে জড়িত সব অনুষ্ঠান বা উৎসব এখানে পালন করা হয়।

৮৩। (ক) আখড়ার নাম ঃ **বড় আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ খাগড়া, পাথারকান্দি।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় একশত বৎসর পূর্বে স্থাপিত এই আখড়াটি।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীশ্রীযতীন্দ্রমোহন গোস্বামী। বর্তমানে এই আখড়ায় কোনো বৈষ্ণব বা সেবায়েত নেই। এজন্য কোনো ধরনের উৎসব অনুষ্ঠান পালিত হয় না। ধীরে ধীরে আখড়াটি বিলুপ্তের পথে।

৮৪। (ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ খাগড়া, পাথারকান্দি।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রী যামিনী দাস বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখনীয়, বর্তমানেও যামিনী দাস বৈষ্ণব এই আখড়ায় মহাপ্রভুর সেবা করে যাচ্ছেন।

(ঙ) উৎসব ঃ বৈষ্ণব ধর্মের রীতি অনুযায়ী সব অনুষ্ঠানই এই আখড়ায় পালন করা হয়।

৮৫। (ক) আখড়ার নাম ঃ **গৌরনিতাই আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ খাগড়া, পাথারকান্দি।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ ছত্রমোহন দাস বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখনীয়, ছত্রমোহন বৈষ্ণব বর্তমানে নিজের প্রতিষ্ঠিত আখড়ায় গৌরাঙ্গের সেবা করে যাচ্ছেন। তিনি সহজিয়া বৈষ্ণব এবং অদ্বৈতাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত।

(ঙ) অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে জড়িত প্রায় সব অনুষ্ঠানই এখানে পালন করা হয়। তবে বিশেষত ঝুলন, দোলযাত্রা ও নিয়ম মাস পালন করা হয়।

৮৬। (ক) আখড়ার নাম ঃ **কানাইলাল জিউ আশ্রম**।

(খ) স্থান ঃ কানাইবাজার, দক্ষিণ করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে এই আশ্রমটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ স্থাপনকর্তার নাম সংগ্রহ করা যায়নি। এমনকী বর্তমান সেবায়েতের নাম জানা যায়নি।

(ঙ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণব ধর্মের সব অনুষ্ঠান পালন করা হলেও রথযাত্রা মহাধুমধামে পালন করা হয়। তথ্যানুসারে জানা যায় যে, কানাইবাজারের এই আশ্রমে রথের আগের দিন জগন্নাথের রথের রশিতে টান দেন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা। পরের দিন সাধারণ

নিয়মানুসারে রথ টানা হয়। এই রথটানা অনুষ্ঠানে শুধু স্থানীয় মানুষ নয় দূর-দূরান্ত অর্থাৎ অন্যান্য রাজ্যের জনসাধারণ যোগদান করেন। বিশেষত ত্রিপুরা রাজ্য থেকে চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারী, পুণ্য অর্জনের আশায় রথের রশি টানতে শামিল হন। সর্বশ্রেণির মানুষ এই রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করার ফলে এই রথকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক বৃহৎ মেলা। সবাই কমবেশি কেনাকাটা করে। সমাজে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।

৮৭। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীরাধারমণ জিউর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ বারইগ্রাম, করিমগঞ্জ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ তথ্য জ্ঞাত নয়। এখানে উল্লেখনীয়, শ্রীশ্রীরাধারমণ ঠাকুর এই আখড়ায় আসার পূর্বে বর্তমান আখড়াটি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সঠিক সময়কাল কেউ-ই জানাতে পারেননি।

(ঘ) বর্তমানে সেবায়েত ঃ এই আখড়ায় (আশ্রমে) অনেক সেবায়েত রয়েছেন। কিন্তু আখড়া দেখাশুনার জন্য কমিটি রয়েছে।

(ঙ) উৎসব ঃ বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে জড়িত সব অনুষ্ঠানই মহাধুমধামে পালন করা হয়। বিশেষত শ্রীশ্রীরাধারমণ গোস্বামীর তিরোভাব দিবসে (৩০-০৬-১৯৭৪) তিন দিনের হরিনাম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা ঃ কাছাড়

৮৮। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ কাটিগড়া বাজার, কাটিগড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ লাতুমণি পাটনি। এখানে উল্লেখনীয়,ঁলাতুমণি পাটনি ছিলেন নিঃসন্তান। তাই জীবনের শেষলগ্নে এসে নিজসম্পত্তির পুরো অংশ আখড়ার নামে দান করেন। তাঁর দাতকৃত জমিতে ১৮০৫ সনে গড়ে ওঠে বৃহত্তর কাটিগড়া অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো আখড়া। পরবর্তী সময়ে আখড়াটির নামকরণ করা হয় 'শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর আখড়া'।

(ঙ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীশ্রীরাধেশ্যাম বাবাজি।

(চ) বর্তমান সেবায়েত ঃ রামকৃষ্ণ দাস মহন্ত এবং সাবিত্রী দাস মহন্ত। তাঁরা দুজনই প্রায় ৩৫ বৎসর থেকে এই আখড়ার সেবায়েত হিসেবে রয়েছেন।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়ায় প্রতিটি উৎসব ও অনুষ্ঠান জাঁকজমকভাবে পালন করা হয়। বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে জড়িত সব অনুষ্ঠানই এই আখড়ায় পালন করা হয়। বিশেষত ঝুলনযাত্রা, রথযাত্রা, নিয়ম মাস ও দোল উৎসব ছাড়াও প্রতিবৎসর নামসংকীর্তন গাওয়া হয়।

৮৯। (ক) আখড়ার নাম ঃ **রাধামাধব আশ্রম**।

(খ) স্থান ঃ সিদ্ধিপুর, কাটিগড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ এই আখড়াটি (আশ্রম) ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ শ্রীমতি কুমুদিনী দাস। এখানে উল্লেখনীয়, কুমুদিনী দাসের এক পুত্রসন্তান ছিল কিন্তু ১২ বৎসর বয়সে তার মৃত্যু হয়। পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি নিজ সম্পত্তি আখড়ার নামে দান করেন। সেইসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেন কোনো ভেকধারী বৈষ্ণবকে আখড়া পরিচালনার জন্য সেবায়েত নিয়োগ করবেন না।

(ঙ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীশ্রীকিরেন্দ্র গোস্বামী। এখানে উল্লেখনীয়, কিরেন্দ্র গোস্বামীর সংগৃহীত অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই গ্রন্তগুলি হল— মনোশিক্ষা, সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা, রাধাকৃষ্ণবিলাস, নারদ সংবাদ, শ্রীশ্রীজগন্নাথ পুরি দেউল তোলা বা নীলাচল মন্দির নির্ম্মাণ প্রভাস খণ্ড, বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র, ভক্তিতত্ত্বসার, শ্রীরঘুনাথলীলামৃত (শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত), তত্ত্বমাধুরীজ্ঞানমঞ্জরী, বরাহ-মিহির ও খনা, লালবাবা মাহাত্ম্য ইত্যাদি।

এ ছাড়া বর্তমান সেবায়েত হীরেন্দ্র গোস্বামীর সংগৃহীত এবং গণেন্দ্রমোহন গোস্বামীর দ্বারা লিখিত 'শ্যাম কিশোরের কড়চা' নামে একটি গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। এই গ্রন্থটি ব্রজবুলি ভাষায় লেখা এবং খুব সম্ভব দুইশত বৎসর পূর্বে অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে দেখে দেখে হাতে লেখা গ্রন্থ। এই আবিষ্কৃত গ্রন্থটির প্রথম সাতটি পৃষ্ঠা ও সায়ত্রিশ পৃষ্ঠার পর আর কোনো পৃষ্ঠার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

(চ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী হীরেন্দ্র গোস্বামী। তিনি গৃহস্থী বৈষ্ণব।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে জড়িত সব অনুষ্ঠানই এই আখড়ায় পালন করা হয়।

৯০। (ক) আখড়ার নাম ঃ **রাধামাধবজীর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ নুননগর (নাথ পাড়া), কাটিগড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ নিত্যানন্দ দাস বৈষ্ণব। তিনি এই আখড়ার মাটি দান করেছিলেন। তাঁর পিতা সমান নাথ যোগীকূলের বৈষ্ণব ছিলেন।

(ঙ) বর্তমান সেবক ঃ অমলানন্দ দাস গোস্বামী।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মে প্রচলিত সবই অনুষ্ঠান বা উৎসব এই আখড়ায় পালন করা হয়।

৯১। (ক) আখড়ার নাম ঃ **রামজী আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ নাতানপুর, কাটিগড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৬৫ ইংরেজিতে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ অতুলরাম দাস।

(ঙ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ সদানন্দ বৈষ্ণব। বর্তমানে কোনো বৈষ্ণব নেই এই আখড়ায়। গ্রামবাসীরাই বর্তমানে দেখাশুনা করেন।

৯২। (ক) আখড়ার নাম ঃ **কানাইয়ের আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ তালকর গ্র্যাণ্ড, কাটিগড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ রাধারাণী বৈষ্ণব। তিনি ভেকধারী বৈষ্ণব।

(ঙ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মে পালিত সব অনুষ্ঠানই এই আখড়ায় পালন করা হয়। বিশেষত প্রতি বৃহস্পতিবার নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

৯৩। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গোস্বামী জিউর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ চণ্ডীপুর (জলালপুর), কাটিগড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীমৎ বলরাম দাস গোস্বামী।

(ঙ) বর্তমানে সেবায়েত ঃ শ্রী হৃদয়ানন্দ দাস গোস্বামী।

(চ) আখড়ার ইতিহাস ঃ এই আখড়াটি রামানুজ মতাদর্শীদের দ্বারা স্থাপিত। এই মতবাদের উদ্যোক্তা হলেন শ্রীশ্রীজগতমোহন গোস্বামী এবং প্রচারক ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গোস্বামী। রামকৃষ্ণ গোস্বামীর আবির্ভাব কাল হল ৯৮৩ বাংলা বা বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ আজ থেকে ৪৩৯ বৎসর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁদের গুরুর নামানুসারে এই আখড়ার নামকরণ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শ্রীশ্রীজগতমোহন গোস্বামীর রচিত 'ভাগবত', 'রামচন্দ্র চণ্ডিকা', 'রামকৃষ্ণ গুণামৃত' ও 'রামকৃষ্ণ জীবনী' ইত্যাদি গ্রন্থ এই আখড়ায় সংরক্ষিত রয়েছে।

(ছ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ রামানুজম (রামায়তী) বৈষ্ণবধর্মে পালিত সব অনুষ্ঠানই এই আখড়ায় পালন করা হয়।

৯৪। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীগোপালকৃষ্ণের আশ্রম।**

(খ) স্থান ঃ ছলিগ্রাম (কালাইন), কাটিগড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৪১০ বঙ্গাব্দ।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখনীয়, তিনি বর্তমানে এই আখড়ার সেবায়েত। তিনি ভেকধারী ও উদাসী বৈষ্ণব।

(ঙ) অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে জড়িত সব অনুষ্ঠানই এখানে পালন করা হয়। বিশেষভাবে আখড়া প্রতিষ্ঠা দিবসে নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

৯৫। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শান্তি আশ্রম।**

(খ) স্থান ঃ ছলিগ্রাম (কালাইন), কাটিগড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ আনুমানিক ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীশ্রীরামদাস মিশ্র দেবগোস্বামী।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ আনন্দদেব দেবগোস্বামী এবং তাঁর সঙ্গী একজন বৈষ্ণবী রয়েছেন। নাম জানা যায়নি। যাই হোক ওরা গৃহস্থী বৈষ্ণব।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মে পালিত সব অনুষ্ঠানই এই আখড়ায় পালন করা হয়। তবে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত করা হয় না। রথের সময় অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

৯৬। (ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ বরইতলি (কালাইন), কাটিগড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে এই আখড়া স্থাপিত হয়েছিল।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীঅতুল দাস বৈষ্ণব। তিনি ঢাকা শহর থেকে এসেছিলেন।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ রঘুনাথ দাস বৈষ্ণব। তিনি গৌড়ীয় মতাবলম্বী বৈষ্ণব।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মের সব অনুষ্ঠানই এই আখড়ায় পালন করা হয়। বিশেষ করে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে ভক্তবৃন্দের সহায়তায় অষ্টপ্রহর সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

৯৭। (ক) আখড়ার নাম ঃ **গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ গড়ের ভিতর (বিহাড়া), কাটিগড়া।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ সুখেন্দু রায় ও তার অন্য তিন ভ্রাতা এই আখড়ার জমি দান করেন। তাদের দানকৃত জমিতে উক্ত আখড়াটি গড়ে উঠেছে।

(ঙ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রী হরিদাস বৈষ্ণব ও কৃষ্ণাদাস বৈষ্ণবী। তাঁরা দুজনই বর্তমানে আখড়ায় মহাপ্রভুর সেবা করে যাচ্ছেন। তাঁরা সহজিয়া বৈষ্ণব।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মে প্রচলিত সব উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বিশেষত জন্মাষ্টমী, ঝুলন, রথযাত্রা, নিয়ম মাস ইত্যাদি জাঁকজমকভাবে পালন করা হয়।

৯৮। (ক) আখড়ার নাম ঃ **গৌরনিতাই আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ গড়ের ভিতর, বিহাড়া (কাটিগড়া)।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৮১ সনে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রী গোপীমোহন বৈষ্ণব ও বিশাখা বৈষ্ণব। তাঁরা দুজনই উদাসী ও সহজিয়া বৈষ্ণব।

(ঙ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ ঝুলন, রথযাত্রা, নিয়ম মাস, জন্মাষ্টমী সহ সবই উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

৯৯। (ক) আখড়ার নাম ঃ **রাধামাধব আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ গড়ের ভিতর, বিহাড়া (কাটিগড়া)।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১২০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) তথ্যদাতা ঃ শ্রী সুখেন্দু দেবনাথ।

(ঙ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ প্রতিষ্ঠাপক বা প্রথম বৈষ্ণবের নাম গ্রামবাসীর জানা নেই। দীর্ঘদিন থেকে এই আখড়ায় কোনো বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবী নেই। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠাপকের নাম বলতে পারেন এই বয়সের কোনো লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। যাই হোক বেশিরভাগ তথ্য এজন্য অজ্ঞাত থেকেই গেল।

১০০।(ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীজগবন্ধু মদনমোহন জিউ আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ ভাঙ্গারপার, বড়খলা।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ নাম জানা যায়নি।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী গোপীবল্লভ দাস গোস্বামী ও সুপ্রিয়া বৈষ্ণব গোস্বামী। এখানে উল্লেখনীয়, উক্ত দুজন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী হলেন জগতমোহিনী পরিবারের দীক্ষিতা। এই জগতমোহিনী বৈষ্ণব পরিবারের নির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি রয়েছে। এই পরিবারের বৈষ্ণবেরা অর্থাৎ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবেরা কপালের তিলকের মধ্যে কুমকুমের লাল তিলক কাটে। প্রায় একইভাবে রামায়তী বা

রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরাও কপালে লাল তিলক কাটে। তবে তাঁরা সিঁদুর দিয়ে লাল তিলক কাটে। আবার রামায়তী মধ্যে দুটি ভাগ রয়েছে। এর একটি ভাগ লাল তিলক কাটে আর অন্য ভাগ তিলক কাটে না। যাই হোক, রামানুজ সম্প্রদায় চৈতন্যদেবের পূর্বে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মে পালিত সব অনুষ্ঠানই এই আখড়ায় পালন করা হয়। বিশেষভাবে উক্ত আখড়ার প্রথম বৈষ্ণবের মৃত্যু তিথি উপলক্ষে (শ্রীপঞ্চমীর পরের দশমী) নামযজ্ঞ কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

১০১।(ক) আখড়ার নাম ঃ **রাধেশ্যামজীর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ ভাঙ্গারপার, বড়খলা।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীমথুরাদাস বৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী জয়মঞ্জরি বৈষ্ণব ও প্রিয়মণি বৈষ্ণবী মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত। তাঁরা সহজিয়া উদাসী বৈষ্ণব। তাঁদের শিষ্য শ্রীগোবিন্দ দাস বৈষ্ণব ও অনঙ্গমঞ্জরী বৈষ্ণবী পরবর্তী সেবায়েত হিসেবে নিয়োজিত হবেন। এখানে বংশ পরম্পরা মেনে বৈষ্ণব নিযুক্ত হন।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মের রীতি অনুযায়ী প্রতিটি উৎসব পালন করা হয়। বিশেষত প্রতি বৎসর মাঘ মাসের প্রথম দিকে ৩২ প্রহর নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

১০২।(ক) আখড়ার নাম ঃ **গোপালজীর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ ভাঙ্গারপার, বড়খলা।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ কিশোরীমোহন বৈষ্ণব ও মোহনপ্রিয়ার তত্ত্বাবধানে প্রথম এই আখড়াটি স্থাপন করা হয়।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী রাসমণি বৈষ্ণব বর্তমানে এই আখড়ার সেবায়েত হিসেবে কাজ করছেন।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মে পালিত সব অনুষ্ঠানই এই আখড়ায় পালন করা হয়। বিশেষত ঝুলন, রথযাত্রা, নিয়ম মাস, দোলযাত্রা মহাধুমধামে পালন করা হয়।

১০৩।(ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ গড়াগ্রাম (বাবুরবাজার), বড়খলা।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপন করা হয়।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ ঝুনু সেন।

(ঙ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ নাম জানা যায়নি। এখানে উল্লেখনীয়, বর্তমানে এই আখড়ায় একজন সেবায়েত রয়েছেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না-পারায় নাম ও বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

১০৪।(ক) আখড়ার নাম ঃ **মদনমোহন আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ ধলাইবাজার, কাছাড়।

(গ) স্থাপনকাল ঃ আনুমানিক ১৯৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণব ঃ শ্রী বৃন্দাবন বৈষ্ণব ও বিরজাদাসী বৈষ্ণবী। তাঁদের পূর্বনাম ছিল বিমল দাস ও প্রতিমা দাস। তাঁরা উভয়ই বর্তমানে এই আখড়ায় কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত।

(ঙ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মে পালিত সব উৎসব-অনুষ্ঠান এই আখড়ায় পালন করা হয়।

১০৫।(ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আশ্রম**।

(খ) স্থান ঃ দেবীপুর, ধলাই।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে এই আখড়াটি স্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণব ঃ শ্রীশ্রীরতনমণি গোস্বামী।

(ঙ) বর্তমান বৈষ্ণব ঃ প্রণয় দাস বৈষ্ণব ও পূর্ণমাসি বৈষ্ণব। উভয়ই মধ্ব্যাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মের রীতি অনুযায়ী সব উৎসব-অনুষ্ঠান এই আখড়ায় পালন করা হয়। বিশেষত ঝুলন, রথযাত্রা, নিয়ম মাস ও দোল উৎসব মহাধুমধামে পালন করা হয়।

১০৬।(ক) আখড়ার নাম ঃ **জল বৈরাগিনীর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ দেবীপুর, ধলাই।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ২০০২ খ্রিস্টাব্দে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ জল বৈরাগিনী। তিনি বর্তমানেও এই আখড়ার সেবায়েত হিসেবে আছেন।

(ঙ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ নিজ সাধ্যমত বৈষ্ণবধর্মে প্রচলিত অনুষ্ঠানগুলি পালন করে থাকেন।

১০৭।(ক) আখড়ার নাম ঃ **রঙ্গ বৈষ্ণবীর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ দেবীপুর, ধলাই।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৮৪ ইংরেজি।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ রঙ্গ বৈষ্ণবী। তিনি বর্তমানে আখড়ার সেবায়েত হিসেবে রত। সেইসঙ্গে নিজসাধ্যানুসারে আখড়ায় উৎসব-অনুষ্ঠান করে থাকেন।

১০৮।(ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ দেবীপুর, ধলাই.

(গ) স্থাপনকাল ঃ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ মনো বৈষ্ণবী। বর্তমানে তিনি এই আখড়ায় কৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত। তিনি যথাসাধ্য আখড়ায় উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করেন।

১০৯।(ক) আখড়ার নাম ঃ **রাধামাধব আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ রামপ্রসাদপুর (কুমারপাড়া), ধলাই।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ অনিল পাল। এখানে উল্লেখ্য, ভূমিদাতার নিকটাত্মীয় শ্রীমধুসূদন দাস বৈষ্ণব ছিলেন গৃহী বৈষ্ণব। বিশেষত তাঁর উদ্যোগেই আখড়াটি স্থাপিত হয়। এবং আখড়াটি স্থাপিত হওয়ার পর শ্রীশ্রীদীনবন্ধু বৈষ্ণব এই আখড়ায় সেবায়েত হিসেবে যোগদান করেন।

(ঙ) বর্তমান বৈষ্ণব ঃ শ্রী হরিদাস বৈষ্ণব। তিনি অদ্বৈত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে তিনি একাঙ্গী বৈষ্ণব।

(চ) সেবা পদ্ধতি ঃ অদ্বৈত পরিবারের নিয়মানুসারে প্রথমে বাল্যভোগ, দুপুরে অন্নভোগ ও বিকালে ফলমূল কৃষ্ণের চরণে নিবেদন করা হয়।

(ছ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়ায় রাধাষ্টমী, ঝুলন, দোল, জন্মাষ্টমী ও অষ্টপ্রহর কীর্তন ইত্যাদি পালন করা হয়।

১১০।(ক) আখড়ার নাম ঃ **রাধাগোবিন্দ জিউর আশ্রম**।

(খ) স্থান ঃ দক্ষিণ পানিভরা, ধলাই।

(গ) স্থাপনকাল ঃ আনুমানিক ৭০-৮০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ লক্ষ্যমণি নাথ।

(ঙ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীশ্রীমোহনচাঁদ গোস্বামী।

(চ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী মধুসূদন বৈষ্ণব ও পার্বতী বৈষ্ণব। তাঁরা উভয়ই মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত ও উদাসী বৈষ্ণব।

(ছ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে জড়িত সব উৎসব-অনুষ্ঠানই এই আখড়ায় পালন করা হয়।

১১১।(ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ জীউর মন্দির**।

(খ) স্থান ঃ পানিভরা (কালীবাড়ি রোড), ধলাই।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৩-১২-২০১৩ ইংরেজি।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ মহারাণী দেবদাসী। তাঁর প্রকৃত নাম হল উমা দাসী। তবে এটি বৈষ্ণবীয় নাম।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী ব্রজেন্দ্রনন্দন দাস ব্রহ্মচারী। তিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ ঝুলন, দোলযাত্রা, রথযাত্রা, নামকীর্তন সহ সবই অনুষ্ঠান এখানে পালন করা হয়।

১১২।(ক) আখড়ার নাম ঃ **রাধামাধব আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ কাবুগঞ্জ বাজার, ধলাই।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে (আনুমানিক ১৯১৩ খ্রিঃ) এই আখড়াটি স্থাপন করা হয়।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ উদ্ধব দাস বাবাজি।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ কানাইদাস বৈষ্ণব। তিনি মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব। এ ছাড়াও তিনি ভেকধারী।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মের নিয়মানুযায়ী প্রায় সব অনুষ্ঠানই এখানে পালন করা হয়। বিশেষত ঝুলন, রথযাত্রা, নিয়ম মাস ও দোলউৎসব মহাধুমধামে পালন করা হয়।

১১৩।(ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ দুলালপুর, ধলাই।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ২০-২৫ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ কালা বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠাপক কালা বৈষ্ণব বর্তমানেও এই আখড়ার সেবায়েত হিসেবে মহাপ্রভুর সেবায় রত।

(ঙ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে জড়িত সবই অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

১১৪।(ক) আখড়ার নাম ঃ **যদুনন্দন বাবাজির আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ দুলালপুর, ধলাই।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১৫-২০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রী যদুনন্দন বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখনীয়, তিনি বর্তমানেও এই আখড়ায় সেবায়েত হিসেবে আছেন।

(ঙ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মে প্রচলিত উৎসব-অনুষ্ঠান যথাসাধ্য তিনি পালন করে থাকেন।

১১৫।(ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গোপাল জিউর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ আইরঙমারা, ধলাই।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে এই আখড়াটি স্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রী সদানন্দ মহন্ত। তাঁর পূর্বনাম ছিল শ্রীসুনীল দাস। তিনি একাঙ্গি বৈষ্ণব। তিনি 'বিতংগল' সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব।

(ঙ) 'বিতংগল' সম্প্রদায়ের ইতিহাস ঃ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই পুণ্যভূমিতে আবির্ভাবের ১০০ বৎসর পূর্বে 'বিতংগল' গোষ্ঠীর মূল প্রবক্তা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গোঁসাই বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হন। এই গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের ৬৮৫ টি আখড়া পুরো বঙ্গভূমিতে ছড়িয়ে রয়েছে। এই গোষ্ঠীর যেসব আখড়া বরাক উপত্যকার নানাস্থানে রয়েছে, সেইসব স্থান হল— 'চণ্ডীপুর', 'লালমাটি' (শ্রীকোনা), 'সাদিরখাল' ও 'কাটিগড়া'। এখানে উল্লেখনীয়, এই 'বিতংগল' গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় থেকে 'সংযুক্ত' নামে আরেকটি উপসম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। এই 'সংযুক্ত' উপসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবেরা 'গৃহস্থী বৈষ্ণব'। এই 'গৃহস্থী বৈষ্ণবেরা' সংসারধর্ম পালন করেন।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণব ধর্মের সব অনুষ্ঠানই এই আখড়ায় পালন করা হয়।

১১৬।(ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীরাধাসুদর্শন মন্দির**।

(খ) স্থান ঃ ঘুংঘুর, সোনাই।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ০৯-০৮-১৯৯২ ইংরেজি।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রী চৈতন্যদাস গোস্বামী ও ব্রজেশ্বরী গোস্বামী।

(ঙ) ভূমিদাতা ঃ শ্রী বিনয় মজুমদার।

(চ) বর্তমান সেবায়েত ঃ প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণবেরাই বর্তমানে সেবায়েত হিসেবেই আছেন। এখানে উল্লেখনীয়, তাঁরা দুজনই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। এ ছাড়া এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শ্রীধাম নবদ্বীপের বিশিষ্ট বৈষ্ণব পণ্ডিত বামী গোস্বামী।

(ছ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মে পালিত সবই অনুষ্ঠান এই আখড়ায় পালন করা হয়। বিশেষভাবে ২০১২ সনে নয়দিন ব্যাপী ভাগবত পাঠ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১১৭।(ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও রাধাগোবিন্দের আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ রাঙিরখাড়ি, শিলচর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ আনুমানিক ১৯৮৪ সনে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীযশোদা বৈষ্ণবী। এখানে উল্লেখ্য, তিনি নিজ সম্পত্তির পুরো অংশ আখড়ার নামে দান করে দিয়েছেন।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী রামানন্দ দাস বাবাজি। তিনি ভেকধারী বৈষ্ণব এবং নিত্যানন্দ পরিবারভুক্ত।

(চ) তথ্যদাতা ঃ যীশুরঞ্জন দে।

(ছ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের ১৭ তারিখ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। এ ছাড়া বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে জড়িত সব উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

১১৮।(ক) আখড়ার নাম ঃ **বিশ্বম্বর মহাপ্রভুর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ ফ্রেন্সনগর (ভাগাবাজার), ধলাই।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীভগবান দাস বৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ নাম জানা যায়নি।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়ায় বৈষ্ণবধর্মে প্রচলিত সবধরনের উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

১১৯।(ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীগোপাল জিউর আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ রাঙিরখাড়ি, শিলচর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি ও শ্রীশ্রীরমা মাইজি।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী শচীনানন্দ দাস বাবাজি। তিনি নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ভুক্ত।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মের নিয়মানুসারে যেসব অনুষ্ঠান রয়েছে সেগুলি এই আখড়ায় যথাযথ পালন করা হয়। বিশেষভাবে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

১২০।(ক) আখড়ার নাম ঃ **তুলারগ্রাম আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ কলেজ রোড, সোনাই।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ৬০-৬৫ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীরামানন্দ বৈষ্ণব।

(ঙ) ভূমিদাতা ঃ নরেন্দ্র দাস ও শশীকান্ত দাস।

(চ) বর্তমান সেবায়েত ঃ বর্তমানে কোনো সেবায়েত নাই। গ্রামবাসীরাই পুজো-অর্চনা করেন।

১২১।(ক) আখড়ার নাম ঃ **নরসিংহ আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ সোনাই বাজার, সোনাই।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীগোপাল দাস বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখনীয়, তিনি রামায়তি বা রামানুজম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। নিজে মাটি ক্রয় করে এই আখড়াটি স্থাপন করেন।

(ঙ) তথ্যদাতা ঃ শ্রী বিষ্ণু চন্দ।

(চ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী রামাচরণদাস মহন্ত। তিনিও রামায়তী সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব।

(ছ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়ার প্রতিষ্ঠাপক বাবাজির নির্দেশমতে বর্তমান সময়ে ঝুলন, রামনবমী, জন্মাষ্টমী, কার্তিক মাসে হরিউত্থান একাদশী সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান, যেসব বৈষ্ণবধর্মে পালিত হয়, তা সুচারুরূপে এই আখড়ায় পালন করা হয়।

১২২।(ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ তুলারগ্রাম, ১ম সোনাই।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীনারায়ণ ঠাকুর। তিনি ডিমাসা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বর্মণের আমন্ত্রণে সোণাই অঞ্চলে আসেন। এখানে রাজার দানকৃত জমিতে এই মন্দির বা আখড়াটি স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীনারায়ণ

ঠাকুরের আদি বাসস্থান ছিল পাবনা জেলায় (বর্তমান বাংলাদেশ)। তিনি ছিলেন গৃহস্থী বৈষ্ণব।

(ঙ) তথ্যদাতা ঃ শ্রী হীরেন্দ্রকুমার গোস্বামী। তিনি 'গোস্বামী' পরিবারের একজন বিশিষ্ট সদস্য।

(চ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী বীণাপাণি গোস্বামী। তিনি ঁরত্ন গোস্বামীর সহধর্মিনী।

(ছ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ পূর্বে বৈষ্ণবধর্মের সব অনুষ্ঠানই মহাধুমধামে পালন করা হত। কিন্তু বর্তমানে নিজ সাধ্যমত নানা অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

১২৩।(ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীরাধামাধব জিউর বিগ্রহ**।

(খ) স্থান ঃ বিলপার, শিলচর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীলোচনরাম বৈরাগী। এখানে উল্লেখনীয়, তাঁর পূর্ব উপাধি ছিল 'সাহা'। তাঁর সঙ্গী বা বৈষ্ণবী ছিলেন ললিতা দাস বৈষ্ণবী।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ জগন্নাথ মিশ্র। তিনি নিত্যানন্দ পরিবারভুক্ত।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়ায় বৈষ্ণবধর্ম সংক্রান্ত সব অনুষ্ঠানই পালন করা হয়। তবে পুরো কাছাড় জেলার মধ্যে এই আখড়ায় রথযাত্রার অর্থাৎ আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অতি জনপ্রিয়। অনেক দূর থেকে উৎসাহী জনতা রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। রথযাত্রা উপলক্ষে এই আখড়ায় বৃহৎ মেলা বসে। তবে কালের প্রবাহে মেলায় আর আগের গরিমা নেই। তবে 'বিলপারের রথ' এই ডাক নামটি এখনও শোনা যায়।

১২৪।(ক) আখড়ার নাম ঃ **দিলখুশ আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ লক্ষ্মীপুর, কাছাড়।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ পবীন্দ্র দাস বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর নাম অজ্ঞাত। এখানে উল্লেখনীয়, প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণবেরা এখনও এই আখড়ায় মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত।

(ঙ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মে পালিত সব অনুষ্ঠানই এখানে পালন করা হয়।

১২৫।(ক) আখড়ার নাম ঃ **মহাপ্রভুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ কচুদরম (সোনাই), কাছাড়।

(গ) স্থাপনকাল ঃ আনুমানিক ৪০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রী দ্বারিকা দাস।

(ঙ) প্রথম বৈষ্ণব ও বর্তমান বৈষ্ণব ঃ উপেন্দ্রনাথ দাস বাবাজি। তিনি বর্তমানেও এই আখড়ার সেবাইত।

১২৬।(ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আখড়** ।

(খ) স্থান ঃ লেবুরবন্দ, উধারবন্দ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ বিষ্ণুদাস বৈষ্ণব ও জ্যোতেশ্বরী বৈষ্ণব। তাঁদের বৈষ্ণব পূর্ব নাম ছিল যথাক্রমে শ্রী বিষ্ণু সিংহ ও জ্যোতি সিংহ।

(ঙ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়ায় বৈষ্ণবধর্মের সবই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বিশেষ করে, ঝুলন, নিয়ম মাস ও দোল উৎসব মহাধুমধামে পালন করা হয়।

১২৭।(ক) আখড়ার নাম ঃ **বাহাদূরপুর আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ বাহাদূরপুর (উধারবন্দ), কাছাড়।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১০০ বছর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ বৈষ্ণব।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী মঞ্জন বৈষ্ণব।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মে পালিত সব অনুষ্ঠানই যথাসম্ভব পালন করা হয়।

১২৮।(ক) আখড়ার নাম ঃ **ফুলেরতলের আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ ফুলেরতল (পানগ্রাম), উধারবন্দ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ আনুমানিক ১০০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণব ঃ শ্রীশ্রীনরোত্তম বাবাজি ও ফুলমতী বৈষ্ণবী।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী বিধুভূষণ দাস বৈষ্ণব। তিনি মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মের মতানুসারে অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্মে পালিত প্রায় সবই উৎসব-অনুষ্ঠান এই আখড়ায় পালন করা হয়। তবে বিশেষভাবে কার্তিক মাসের ২৭ তারিখ ঁনরোত্তম বাবাজির জন্মোৎসব বিশেষভাবে পালন করা হয়।

১২৯।(ক) আখড়ার নাম ঃ **কালাচাঁন্দ আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ উধারবন্দ বাজার, উধারবন্দ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ পান্নালাল রায় ও টিঙ্কু রায়।

(ঙ) প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণব ঃ শ্যামলী বৈষ্ণবী।

(চ) বর্তমান সেবায়েত ঃ রসিকলাল বৈষ্ণব।

(ছ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ কালাচাঁন্দের মতানুসারে এই আখড়ায় সব অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বিশেষভাবে, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, মঙ্গলা (কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয়) ইত্যাদি পালন করা হয়। এ ছাড়া প্রতি বৎসর মাঘ মাসের ৭ তারিখ প্রতিষ্ঠা উৎসব পালন করা হয়।

১৩০।(ক) আখড়ার নাম ঃ **নরোত্তম দাসের আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ মধ্য লারছিংপার, উধারবন্দ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক ঃ শ্রীশ্রীনরোত্তম দাস।

(ঙ) আখড়াটির ইতিহাস ঃ প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণব শ্রীশ্রীনরোত্তম দাসের জন্ম হয় উধারবন্দের উত্তর লপার গ্রামে। তিনি সংসার জীবনে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু কোনো উত্তরাধিকারীর জন্ম হয়নি।

ঘটনাক্রমে তাঁরই আত্মীয় শ্রীশ্রীভৈরব মালাকার নিজ জন্মভূমি ধোয়ারবন্দের 'বালিচরি' গ্রামে একটি আখড়া স্থাপন করেন এবং সেই আখড়ায় গিয়ে নরোত্তম দাস সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই বালিচরি থেকে চলে আসেন নিজ জন্মভূমিতে। অর্থাৎ শ্রীশ্রীনরোত্তম বাবাজি লারাছিংগ্রামের মধ্যলাপারে একটি আখড়া স্থাপন করেন। এবং এই আখড়ায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু কালের প্রবাহে তাঁর দেহত্যাগের পরই এই আখড়ার বিলুপ্তি ঘটে।

১৩১।(ক) আখড়ার নাম ঃ **লক্ষ্মণদাসের আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ মধ্যলপার (লারছিংপার), উধারবন্দ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৭০-৮০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণব ঃ শ্রীশ্রীলক্ষ্মণ দাস বৈষ্ণব।

(ঙ) আখড়াটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ শ্রীশ্রীলক্ষ্মণ দাস বৈষ্ণব মহাপ্রভুর প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে তাঁর নাম ছিল শ্রী লোকেশ্বর মালাকার। তিনি শারীরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত বলশালী লোক ছিলেন। তাঁর ডাকনাম ছিল লুক্কা। তিনি ছিলেন নিরামিষভোজী। যাই হোক, মধ্যলফার নিবাসী শ্রী রজনী মালাকারের দানকৃত জমিতে আখড়াটি নির্মাণ করেছিলেন।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মে পালিত সব অনুষ্ঠানই এই আখড়ায় পালন করা হয়।

১৩২।(ক) আখড়ার নাম ঃ **দুধপাতিল সর্বজনীন বড় আখড়া**।

(খ) স্থান ঃ দুধপাতিল ৫ম খণ্ড, উধারবন্দ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়। এটি বৃহত্তর দুধপাতিল এলাকার সবচেয়ে পুরোনো আখড়া।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ জনৈক মাঝারভূঁইয়া উপাধিধারী ব্যক্তি নিজসত্ত্বের অংশ থেকে প্রায় ৩ কেদার বা ৭২ কাঠা উর্বর ভূমি দান করেছিলেন এই আখড়াটির নামে।

(ঙ) আখড়াটির ইতিহাস ঃ কাছাড়ি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বর্মণ তৎকালীন কাছাড় জেলার ১৬ জন নাথ

সম্প্রদায়ের সমাজপতিকে পান-সুপারি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। এই ১৬ জনের মধ্যে একজন হলেন দুধপাতিল, ৫ম খণ্ডের (অন্নপূর্ণাঘাটের) জনৈক 'মাঝারভূঁইয়া' উপাধিধারী ব্যক্তি। তবে এসব উপাধি রাজার প্রদত্ত। যাই হোক, এই পরিবারের লোকেরা উক্ত আখড়ার জমি দান করেছিলেন। প্রতিষ্ঠাকালে এই আখড়াটি বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ইট-সিমেন্টের সাহায্যে সুন্দর ও সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণের কাজ চলছে।

(চ) প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণব ঃ নাম জানা যায়নি।

(ছ) বর্তমান সেবায়েত ঃ সুবল দাস বাবাজি। তিনি মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব।

(জ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবীয় সব উৎসবই এখানে পালন করা হয়। বিশেষত, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, রথ ইত্যাদি পালন করা হয়।

১৩৩।(ক) আখড়ার নাম ঃ **রাধামাধব আশ্রম**।

(খ) স্থান ঃ বাহাদুরপুর, উধারবন্দ।

(গ) স্থাপনকাল ঃ ১৩৩৫ বাংলা।

(ঘ) স্থাপনকর্তা ঃ শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ গোস্বামী। তাঁর বৈষ্ণবীর নাম ছিল স্বর্ণপ্রিয়া বৈষ্ণবী। তাঁরা মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানে উল্লেখনীয়, শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীশ্রীরাসবিহারী গোস্বামী। তিনি ছিলেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডা। তিনি সুদূর উড়িষ্যা থেকে প্রতি বৎসর এইসব অঞ্চলে আসতেন। পরে স্থানীয় জনসাধারণের অনুরোধে এই আখড়াটি স্থাপন করে আজীবন এখানেই থাকেন।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ মদনমোহন দাস গোস্বামী ও রঙ্গপ্রিয়া বৈষ্ণবী। তাঁরা উভয়েই মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে ভেকধারী বৈষ্ণব।

(চ) স্থাপনকর্তার পরবর্তী বৈষ্ণব তালিকা ঃ ক্রম অনুযায়ী শ্রীশ্রীজগদানন্দ দাস গোস্বামী ও আনন্দপ্রিয়া বৈষ্ণবী; মধুমঙ্গল দাস বৈষ্ণব; বনমালী দাস বৈষ্ণব।

(ছ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ এই আখড়ায় বৈষ্ণবধর্মে পালিত প্রায় সব উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

বিশেষকরে— ঝুলন, নিয়ম মাস, রথযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি। এখানে উল্লেখনীয়, এই আখড়া নিয়ে অনেক জনশ্রুতি জনসমাজে প্রচলিত রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে নানা-অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের বহর।

১৩৪।(ক) আখড়ার নাম ঃ **রাধামাধব আখড়া।**

(খ) স্থান ঃ আইরংমারা, ধলাই (কাছাড়)।

(গ) স্থাপনকাল ঃ প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) ভূমিদাতা ঃ ক্ষিতিশচন্দ্র পাল মহাশয়।

(ঙ) প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণব ঃ শ্রীশ্রীরাজবিহারী বৈষ্ণব। তিনি সহজিয়া ও উদাসী বৈষ্ণব ছিলেন। এখানে উল্লেখনীয়, বর্তমানে এই আখড়ায় কোনো বৈষ্ণব নেই।

১৩৫।(ক) আখড়ার নাম ঃ **শ্যামপুর ভক্তবৃন্দ আশ্রম।**

(খ) স্থান ঃ কাঠালবাগান, শিলচর।

(গ) স্থাপনকাল ঃ আনুমানিক ৩০ বৎসর পূর্বে এই আখড়াটি স্থাপিত হয়।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাপক বৈষ্ণব ঃ শ্রীশ্রীসুবল দাস বাবাজি। তিনি উদাসী বৈষ্ণব ছিলেন।

(ঙ) বর্তমান সেবায়েত ঃ শ্রী সুজিত দাস বৈষ্ণব। তিনিও উদাসী বৈষ্ণব।

(চ) উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ বৈষ্ণবধর্মে পালিত সব উৎসব-অনুষ্ঠান যথাসম্ভব পালন করা হয়।

বরাক উপত্যকার আরও কয়েকটি আখড়ার নাম ও স্থানের পরিচয় নিম্নে তোলে ধরা হল ঃ

১। গোবিন্দজীর আখড়া, কাউদীঘিরপার (নিলামবাজার), করিমগঞ্জ।

২। নরসিংহ আখড়া, বালিদীঘিরপার (নিলামবাজার), করিমগঞ্জ।

৩। মহাপ্রভুর আখড়া, সৈয়দকানি (নিলামবাজার), করিমগঞ্জ।

৪। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আখড়া, বাহাদূরপুর (নিলামবাজার), করিমগঞ্জ।

৫। মহাপ্রভুর আখড়া, ঈশ্বরশ্রী (নিলামবাজার), করিমগঞ্জ।

৬। মহাপ্রভুর আখড়া, নগিপুর (নিলামবাজার), করিমগঞ্জ।

৭। চরণদাস বাবাজির আখড়া, আম্বরখানা, করিমগঞ্জ।

৮। মহাপ্রভুর আখড়া, কিন্নরখাল (কাটিগড়া), কাছাড়।

৯। গোপালের আখড়া, সুবোধনগর (কাটিগড়া), কাছাড়।

১০। মহাপ্রভুর আখড়া, সুবোধনগর (কাটিগড়া), কাছাড়।

১১। মহাপ্রভুর আখড়া, কর্ণমধু, করিমগঞ্জ।

১২। মহাপ্রভুর আখড়া, মাইজগ্রাম, করিমগঞ্জ।

১৩। মহাপ্রভুর আখড়া, জিয়াধরা, করিমগঞ্জ।

১৪। মহাপ্রভুর আখড়া, সাদারাশি, করিমগঞ্জ।

১৫। মহাপ্রভুর আখড়া, বটররশি, করিমগঞ্জ।

১৬। মহাপ্রভুর আখড়া, লক্ষ্মীবাজার, করিমগঞ্জ।

১৭। মহাপ্রভুর আখড়া, মহিষাসন, করিমগঞ্জ।

১৮। মহাপ্রভুর আখড়া, সুতারকান্দি, করিমগঞ্জ।

১৯। মহাপ্রভুর আখড়া, ফাকুয়াগ্রাম, করিমগঞ্জ।

২০। সন্ন্যাসীপাট্টা আখড়া, ফাকুয়াগ্রাম, করিমগঞ্জ।

২১। মহাপ্রভুর আখড়া, নয়ানবি (শনবিল), করিমগঞ্জ।

২২। মহাপ্রভুর আখড়া, ছোটোগুণা, করিমগঞ্জ।

২৩। গোপালের আখড়া, কালাছড়া, করিমগঞ্জ।

২৪। মহাপ্রভুর আখড়া, শনবিল (কালীবাড়ি রোড), করিমগঞ্জ।

২৫। মহাপ্রভুর আখড়া, নালারপার (শনবিল), করিমগঞ্জ।

২৬। নিতাইয়ের আখড়া, ভবানীপুর (শনবিল), করিমগঞ্জ।

২৭। রাধাগোবিন্দ আখড়া, কৃষ্ণনগর, করিমগঞ্জ।

২৮। মহাপ্রভুর আখড়া, ভবানীপুর, করিমগঞ্জ।

২৯। গোপালের আখড়া, কালাচূড়, করিমগঞ্জ।

৩০। মহাপ্রভুর আখড়া, চান্নিঘাট (শনবিল), করিমগঞ্জ।

৩১। মহাপ্রভুর আখড়া, আনিপুর (রামকৃষ্ণ নগর), করিমগঞ্জ।

৩২। মহাপ্রভুর আখড়া, কদমতলা (রামকৃষ্ণ নগর), করিমগঞ্জ।

৩৩। মহাপ্রভুর আখড়া, জবাইনপুর, করিমগঞ্জ।

৩৪। মহাপ্রভুর আখড়া, লাতু, করিমগঞ্জ।

৩৫। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আখড়া, মহিষাসন, করিমগঞ্জ।

৩৬। মহাপ্রভুর আখড়া, সাদারাশি, করিমগঞ্জ।

৩৭। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আখড়া, ডলুরপার (রামকৃষ্ণ নগর), করিমগঞ্জ।

৩৮। মহাপ্রভুর আখড়া, কচুখাউরি (রাতাবাড়ি), করিমগঞ্জ।

৩৯। নগেন্দ্র নগর আখড়া, নগেন্দ্র নগর (দক্ষিণ করিমগঞ্জ), করিমগঞ্জ।

৪০। বিলগ্রাম আখড়া, বিলগ্রাম (দক্ষিণ করিমগঞ্জ), করিমগঞ্জ।

৪১। বীরগ্রাম আখড়া, বীরগ্রাম (দক্ষিণ করিমগঞ্জ), করিমগঞ্জ।

৪২। সখীচরণ বৈষ্ণবের আখড়া, বসন্তপুর (শনবিল), করিমগঞ্জ।

৪৩। পল্টন আখড়া, বাজারঘাট, করিমগঞ্জ।

৪৪। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আখড়া, দোহালিয়া বাজার, করিমগঞ্জ।

৪৫। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আখড়া, পূর্বগুল (আছিমগঞ্জ), করিমগঞ্জ।

৪৬। শেওরালা আখড়া, পাথারকান্দি, করিমগঞ্জ।

৪৭। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আখড়া, জুলাইগ্রাম (আছিমগঞ্জ), করিমগঞ্জ।

৪৮। কাকিবাবার আখড়া, মেন্দিবাড়ি (পাথারকান্দি), করিমগঞ্জ।

৪৯। কানাইবাজার আখড়া, কানাইবাজার (পাথারকান্দি), করিমগঞ্জ।

৫০। মদনমোহন আখড়া, পূর্বময়না (পাথারকান্দি), করিমগঞ্জ।

৫১। গোপীনাথ আখড়া, পশ্চিম ময়না (পাথারকান্দি), করিমগঞ্জ।

৫২। গোপীনাথের আখড়া, বারইগ্রাম, করিমগঞ্জ।

৫৩। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আখড়া, সরিষা, করিমগঞ্জ।

৫৪। মদনমোহন আখড়া, কর্ণমধু, করিমগঞ্জ।

৫৫। কানাইয়ের আখড়া, কর্ণমধু, করিমগঞ্জ।

৫৬। দক্ষিণ কর্ণমধু আখড়া, দক্ষিণ কর্ণমধু, করিমগঞ্জ।

৫৭। মহাপ্রভুর আখড়া, আনিপুর বস্তী (রাতাবাড়ি), করিমগঞ্জ।

৫৮। পেঁচআলাবস্তী আখড়া, রাতাবাড়ি, করিমগঞ্জ।

৫৯। পাতিয়ালা আখড়া, রাতাবাড়ি, করিমগঞ্জ।

৬০। পাগলাবাবার আখড়া, রাতাবাড়ি, করিমগঞ্জ।

৬১। নিভিয়া বাজার আখড়া, রাতাবাড়ি, করিমগঞ্জ।

৬২। গোপালের আখড়া, মনাছড়া, হাইলাকান্দি।

৬৩। মহাপ্রভুর আখড়া, বড়বন্দ, হাইলাকান্দি।

৬৪। জগন্নাথ মহাপ্রভুর আখড়া, কুয়ারপার (আলগাপুর), হাইলাকান্দি।

৬৫। মহাপ্রভুর আখড়া, সাতমাইল (আলগাপুর), হাইলাকান্দি।

৬৬। নরোত্তম গোঁসাইয়ের আখড়া, মোহনপুর, হাইলাকান্দি।

৬৭। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আখড়া, কুন্দনালা-বরুণছড়া (কাটলিছড়া), হাইলাকান্দি।

৬৮। রাধাগোবিন্দ আখড়া, ভেড়িওয়ালা (আলগাপুর), হাইলাকান্দি।

৬৯। রাধামাধব আখড়া, লক্ষ্মীশহর কলোনী, হাইলাকান্দি।

৭০। লালপানি আখড়া, লালপানি (কাটলিছড়া), হাইলাকান্দি।

৭১। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আখড়া, তোপখানা, হাইলাকান্দি।

৭২। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ আশ্রম, বরুয়ালা (আনিপুর), করিমগঞ্জ।

৭৩। নিতাইগৌর আখড়া, এংলাবাজার, বদরপুর।

৭৪। দরগাবাজার আখড়া, দরগাবাজার, বদরপুর।

৭৫। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আখড়া, মহাকল, বদরপুর।

৭৬। মহাপ্রভুর আখড়া, সোনাই, কাছাড়।

৭৭। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আখড়া, নয়াবাজার (সোনাই), কাছাড়।

৭৮। গোপালের আখড়া, চাম্পাটিলা, উধারবন্দ।

৭৯। গোপালের আখড়া, আইরংমারা, কাছাড়।

৮০। মহাপ্রভুর আখড়া, কুম্ভাবাগান, উধারবন্দ।

৮১। মহাপ্রভুর আখড়া, ফুলেরতল, লক্ষ্মীপুর।

৮২। গৌরাঙ্গ বাবাজির আখড়া, শ্রীকোনা, কাছাড়।

৮৩। মহাপ্রভুর আখড়া, মাছঘাট (মাছিমপুর), কাছাড়।

৮৪। মহাপ্রভুর আখড়া, ফুলবাড়ি, কাটিগড়া।

৮৫। মহাপ্রভুর আখড়া, তিনঘরিগ্রাম (শালচাপরা), কাছাড়।

৮৬। মহাপ্রভুর আখড়া, প্যাঁচনগর (ধলাই), কাছাড়।

৮৭। গৌরগোবিন্দ আখড়া, করচূড়া (কালাইন), কাছাড়।

৮৮। মহাপ্রভুর আখড়া, জারইলতলা, বড়খলা।

৮৯। ভবানন্দ বৈষ্ণবের আখড়া, ভাগাবাজার, ধলাই।

৯০। মহাপ্রভুর আখড়া, আমড়াঘাট, ধলাই।

৯১। মহাপ্রভুর আখড়া, পালংঘাট, ধলাই।

৯২। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের আখড়া, মাছিমপুর, বড়খলা।

৯৩। শ্যামানন্দ আশ্রম, শ্যামানন্দ রোড, শিলচর।

৯৪। শ্রীশ্রীকাঠিয়াবাবার আখড়া, শ্যামানন্দ রোড, শিলচর।

৯৫। নরসিংহ আখড়া, রামনগর, শিলচর।

৯৬। হরিণাবস্তী আখড়া, সোনাই, কাছাড়।

৯৭। কালীনাথ দেবের আখড়া, আমড়াঘাট, কাছাড়।

৯৮। মহাপ্রভুর মন্দির, করাতিগ্রাম (রংপুর), শিলচর।

৯৯। মহাপ্রভুর মন্দির, হাওয়াইতাং, ধলাই।

১০০।শ্রীশ্রীনরসিংহ আখড়া, রংপুর, উধারবন্দ।

১০১।মদনমোহন আখড়া, তারাপুর, শিলচর।

১০২।রাধাগোবিন্দ আশ্রম, জলালপুর, কাটিগড়া।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১। উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ, কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১।

২। বি. সি. অ্যালেন, আসাম ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটার্স্, পৃঃ ১।

৩। ড° শিবপতন বসু, বরাক উপত্যকার মুসলিম সমাজ, পৃঃ ৮।

৪। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, কামরূপ শাসনাবলী, পৃঃ ৪৮।

৫। উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ, কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৫।

৬। উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ, কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৫।

৭। মিহির ভট্টাচার্য, ভাষা, জাতি ও রাষ্ট্র, পৃঃ ৪৮।

৮। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃঃ ১০৩।

৯। বি. সি. অ্যালেন, আসাম ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটার্স্, পৃঃ ২৭।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বরাক উপত্যকার জনজীবনে আখড়ার প্রভাব, গুরুত্ব ও ভূমিকার কথা, বরাক উপত্যকায় আখড়া ও বৈষ্ণবকে কেন্দ্র করে সংগঠিত সাহিত্য-সংস্কৃতি-উৎসব-মেলার কথা; বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশে আখড়া নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে কি কি অসুবিধের সম্মুখীন এবং এই অসুবিধা বা সমস্যা সমাধানের উপায়— এই অধ্যায়ে তোলে ধরার প্রচেষ্টা করব। এখন এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা যাক—

আখড়ার কার্যক্রম, প্রয়োজনীয়তা ও সমাজে প্রভাব ঃ

(১) াখড়া বা বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি জনগণের সমসাময়িক যুগের প্রয়োজন মেটায়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দীক্ষা দিয়ে ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়াকে মন্থর করে। স্থানীয় মানুষদের শিক্ষার জন্য টোল ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অনাথদের বিনা খরচায় পড়াশুনা করানো, সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সেবাও বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি বা আখড়া করে থাকে। আখড়ার মধ্যে রয়েছে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব। কিন্তু বর্তমানে এসবের ব্যতিক্রমও ঘটছে। যুগের প্রভাবে আজকাল আর সাধ্যমত সেবা করা যায় না। আখড়ার বৈষ্ণবদের জীবনধারণ করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

(২) উৎসব অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব কেন্দ্র ঘিরে মেলা হয়। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আখড়াকে কেন্দ্র করে যেসব মেলা অনুষ্ঠিত হয় সেগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারলে আখড়ার সামাজিক মর্যাদা অনেক গুণ বেড়ে যায়। বরাক উপত্যকায় এ ধরনের আখড়ার সংখ্যা খুব কম নয়। শিলচরের 'বিলপার আখড়া', করিমগঞ্জের 'রাধারমণ গোস্বামী জিউর আখড়া' অন্যতম। এ ছাড়াও অনেক আখড়া রয়েছে বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠানে প্রচুর লোকসমাগম হয়। সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার্থে এসব অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

(৩) ব্রাহ্মণ ও বর্ণহিন্দুর সমাজ ছিল আত্মসমাহিত ও বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন। গণ্ডিবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য তারা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে পড়েন। বিশেষত বলা যায়, ব্রাহ্মণ সমাজের

বাইরে তাদের সামাজিক সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু গৌড়ীয় নববৈষ্ণব আন্দোলন তাতে গতি ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

(৪) আখড়ার বৈষ্ণবদের মধ্যে কোনো ধর্মীয় বা জাতিভিত্তিক ভেদাভেদ নেই। যদিও চৈতন্য পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণবদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রভাব দেখা যায়। তাসত্ত্বেও বলা যায়, জাতপাতভিত্তিক হিন্দু সমাজব্যবস্থায় অব্রাহ্মণ ভুঁইমালি ঝড়ু ঠাকুর চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের বদান্যতায় বৈষ্ণব ভেক ধারণ করে সমাজের উঁচুস্থান দখল করেছিলেন। উঁচুবর্ণের মানুষেরা বৈষ্ণব ঝড়ু ঠাকুরের পায়ে মাথা নত করতে দ্বিধাবোধ করত না। আর এসব সম্ভব হয়েছিল চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে। শুধু ঝড়ু ঠাকুর নয়; আরও কত অব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সর্শ্রেণির মানুষের মাথার মণি ছিলেন।

(৫) স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা— এসব বিষয়ে আখড়ার বৈষ্ণব বাবাজিদের অবদান অপরিসীম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করা হয়।

সমাজ সংস্কারে আখড়া ও বৈষ্ণবদের অবদান ঃ

(১) ঐতিহ্যগত বিয়ে প্রথার সংস্কার ঃ চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে কিংবা বলা যায়, আখড়ায় আশ্রিত বৈষ্ণব সমাজে বর্ণভেদ প্রথা অপ্রচলিত। বৈষ্ণব সমাজে জাতপাতের কোনো স্থান নেই। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদের নীতিনিয়মকে উপেক্ষা করে যেকোনো সমাজভুক্ত বা বর্ণভুক্ত নরনারী বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারে। তবে বৈষ্ণবদের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদী নিয়ম অপ্রচলিত। বৈষ্ণবীয় নিয়মানুসারে কণ্ঠিবদল করে, তুলসি সাক্ষ্য রেখে বিয়ের পর্ব সমাপন করা হয়। প্রায় গার্ন্ধব্য বিয়ের মতোই এসব বিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। বৈষ্ণবদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ প্রচলিত রয়েছে; তবে খুব কম এ ধরনের ঘটনা ঘটে। তবে পণপ্রথার কোনো স্থান নেই।

(২) শ্রাদ্ধ ঃ বৈদিক কিংবা ব্রাহ্মণ্যবাদী মতে বিশাল খরচের বহর না-করে শুধুমাত্র নামকীর্তন ও বৈষ্ণবভোজন সেইসঙ্গে প্রতিবেশি ও আত্মীয়স্বজনকে বৈষ্ণব সেবার মহাপ্রসাদ বিতরণ করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সমাপন করা হয়। অন্যদিকে বৈদিক মতে শ্রাদ্ধে গো-দান, স্বর্ণদান, খাটপালঙ্ক, বিছানা ও বাসনপত্র থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু পুরোহিতকে দান করতে হয়। অনাথ লোকটির টাকা-

পয়সা খরচ করার ক্ষমতা থাকুক বা না-থাকুক ব্রাহ্মণ প্রদত্ত ফর্দ অনুযায়ী শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। অনেক সময় সম্পত্তি বিক্রি করার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু বৈষ্ণব মতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করলে টাকা-পয়সা খরচ থেকে বাঁচা যায়। বৈষ্ণব বাবাজিদের যৎসামান্য দান-দক্ষিণা করলেই হয়। পুরোহিতদের মতো তাঁদের কোনো দাবি থাকে না। যাই হোক, বৈষ্ণব মতে এসব অনুষ্ঠান করলে টাকা-পয়সার দিক দিয়ে প্রচুর রেহাই পাওয়া যায়।

(৩) সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে মানবতাবাদের প্রচার করা হয়। বিশেষত বলা যায়, চৈতন্যদেব এবং বৈষ্ণব ভাবকে কেন্দ্র করে যেসব সাহিত্য রচিত হয়েছে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এসব বর্ণবাদ বিরোধী লেখা তথা মানবতাবাদী লেখার প্রভাবে সমাজ এক নতুন গতিপথ পেয়েছে। হিংসা-নিন্দার উর্ধে ওঠে মানুষ সুস্থ জীবনযাপনে সহায়তা পেয়েছে।

(৪) চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম পূর্বের সংকীর্ণ সমাজব্যবস্থা থেকে বের হয়ে এক উদার জাতপাতহীন সমাজ গঠন করে। যদিও মহাপ্রভুর পরবর্তী সময়ে অতি কৌশলে বৈষ্ণবধর্মে ব্রাহ্মণ্যবাদী মনোভাব জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষত মহাপ্রভুপন্থী জাত বৈষ্ণবেরা খুব বেশি উদার ও সরল আচারী হয়।

(৫) মহাপ্রভুর নামানুসারে ব্যক্তির নাম, জায়গার নাম কিংবা গ্রামের নাম মহাপ্রভুর পরবর্তী সময়ে খুব রাখা হত। বর্তমানেও কমবেশি প্রচলিত। যেমন, ব্যক্তির নাম— গৌরাঙ্গ, গৌরনিতাই, নিত্যানন্দ, নিমাই ইত্যাদি। স্থানের নাম— গৌরাঙ্গপুর, নিত্যানন্দপুর, নিতাইনগর ইত্যাদি। বরাক উপত্যকায় এ ধরনের কত মানুষের নাম কিংবা গ্রামের নাম রয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

(৬) চৈতন্য সমকালীন সময়ে কিংবা তৎপূর্ববর্তী সময়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের একটি অংশ কুপথে পরিচালিত হয়েছিল। আবার এই অংশের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ন্যাড়ান্যাড়ি এই বৌদ্ধসম্প্রদায় মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট হয়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। তবে তাঁদেরকে বৈষ্ণবধর্মে নিয়ে আসতে স্থানীয় বৈষ্ণব কিংবা আখড়ার অবদান কোনো ক্ষেত্রে কম নয়।

(৭) হিন্দুধর্মের পতাকাবাহী উঁচুবর্ণের লোকেরা শূদ্রগুরুর কাছে দীক্ষা নেয়। চৈতন্যপূর্ব যুগে যা ছিল কাল্পনিক। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, যদুনাথ বিদ্যাভূষণ এ ধরনের কত লোক শূদ্র নরোত্তম দত্তের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন।

(৮) সপ্তভূমের এক ভূম হল মল্লভূম। এই মল্লভূম ছিল মালাকার সম্প্রদায়ের আদিবাসস্থান। তবে অন্যান্য স্থানেও মালাকার সম্প্রদায় বসবাস করতেন। বরাক উপত্যকার বিশেষত স্বাধীনতাপূর্ব কাছাড় জেলার মালাকার সম্প্রদায়ের আদি বাসস্থান এই মল্লভূমি। এই মল্লভূমির একসময়ের রাজা বীরহাম্বী দুর্ধর্ষ রাজা ছিলেন। খুন, লুটপাত এসব ছিল নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। তিনিও মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট হয়ে প্রায় বৈষ্ণব হয়ে যান। আর এই বীরহাম্বীর বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করার মূলে ছিলেন বৈষ্ণবসমাজ।

আখড়াকে কেন্দ্র করে কীর্তন বা সঙ্গীত ঃ

অপভ্রংশ অবহট্ট ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচিত হয়েছিল। আর তাতেই বৈষ্ণব কীর্তনের সূত্রপাত। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্য এসব কীর্তন বা সঙ্গীতের আদিসঙ্গীত— একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বাংলা ভাষায় কৃষ্ণকাহিনিমূলক প্রাচীন কীর্তন বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে কীর্তন ছিল গণবিনোদনের একটি মাধ্যম। তাতে সবসময় ভক্তির ভাব তেমন স্পষ্ট নয়। নরনারীর প্রেম যে মানসিক প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে, চৈতন্যপূর্ব কীর্তনে তা সুস্পষ্ট। পদাবলী রচয়িতা উপাস্য দেবতাকে মনের কথা খুব কম ক্ষেত্রেই জানিয়েছেন।

চৈতন্যদেব কীর্তনকে জনসংযোগের একটি মাধ্যম রূপে ব্যবহার করেছিলেন। মহাপ্রভুর কীর্তন ছিল 'নামকীর্তন' এবং 'নগরকীর্তন'। এসব কীর্তনের জাতবিচার ছিল না। কবি লোচন দাস লিখেছেন—

"সপ্তদ্বীপ মহীমাঝে তাহে নবদ্বীপ সাজে,
তাহে নব প্রেমার প্রকাশ।" (বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, পৃঃ ১৫৫)

'নবপ্রেমার' প্রকাশ হয়েছিল নর্তন উল্লাস সহ নাম ও নগরকীর্তনে। কীর্তনীয়াদের সাতটি দল গঠিত হয়েছিল। কবি প্রেমানন্দ লিখেছেন—

"হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ।।"

মহাপ্রভু যেভাবে গানকে ভক্তি প্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেছিলেন, তার কোনো সমান্তর বঙ্গদেশে ছিল না। নামকীর্তন এবং নগরকীর্তনের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলি নিম্নে তোলে ধরা হল—

(১) এই কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য করা হত।

(২) এই কীর্তনের কোনো কাহিনিমূলক ভিত্তি ছিল না, কোনো বিশেষ বিদগ্ধতাও ছিল না।

(৩) এসব কীর্তন কোনো বুদ্ধির, যুক্তির প্রকাশ ছিল না।

(৪) তার কোনো সুসংস্কৃত নন্দনতত্ত্ব ছিল না।

(৫) এসব কীর্তনে ভক্তির দুর্নিবার প্রক্ষোভে কীর্তন গায়কগণ, কীর্তনিয়া, শ্রোতারা হেঁসেছেন, কেঁদেছেন, নেঁচেছেন, ধুলায় গড়াগড়ি দিয়েছেন; স্ত্রীলোকেরা উলুধ্বনি দিয়েছেন।

অনেক জায়গায় এসব কীর্তনের সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিশেষত আমাদের বরাক উপত্যকায় যেসব কীর্তন গান অনুষ্ঠিত হয়, তাতে স্থানীয় ভাষার অবাধ প্রবেশ ঘটেছে। সেইসঙ্গে বলা যায়, নামসংকীর্তন, নগরকীর্তন, কার্তিকমাসে ভোরবেলায় কীর্তন গাওয়া— আখড়া কিংবা সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তদের সাধারণ রীতি। এসব কীর্তন শুনার জন্য মানুষ উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।

বরাক উপত্যকায় আখড়াকে কেন্দ্র করে তেমন সাহিত্য রচনা হয়নি। দু-চারজন বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবী রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কবিতা বা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সাহিত্যকৃতি সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছুতে পারেনি। এর মূল কারণ এসব রচনা বা সাহিত্যকৃতি ছাপাখানার মুখ দেখতে পায়নি। না-পাওয়ার আরেকটি কারণ আর্থিক দৈন্যতা। অনেকের লেখার ক্ষমতা থাকলেও তাঁরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এই আর্থিক দৈন্যতার জন্য। এ ছাড়া বেশির ভাগ বৈষ্ণব কিংবা বৈষ্ণবী লেখা-পড়ার ক্ষেত্রে বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারেননি। নানা-সামাজিক কারণে তাঁরা বাধ্য হয়ে ভেক ধারণ করেছেন। আরেকটি কারণ থাকতে পারে, বৈষ্ণবরা সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করলে হয়তো মনে অহংবোধ আসতে পারে। আর এই অহংবোধ বৈষ্ণব ধর্মের পরিপন্থী। অনেক শিক্ষিত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছি যে একদিকে যেমন আর্থিক দৈন্যতার কথা ঝাপসা ঝাপসা ভাবে প্রকাশ করেছেন তেমনি অহংবোধের কথাও এসেছে। এ ছাড়াও আরেকটি অসুবিধার কথা হল প্রকাশকদের অভাব। কোনো প্রকাশক নিজের টাকা-পয়সা খরচ করে এসব সাহিত্য প্রকাশ করার ঝুঁকি নেন না। এটি শুধু আখড়ায় সৃষ্ট সাহিত্যের কথা নয়; যেকোনো সাহিত্যিকের বিশেষ করে বরাক উপত্যকার পরিকাঠামোগত অসুবিধার কারণে নতুন সৃষ্টি প্রকাশ পাচ্ছে না।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশে আখড়ার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার অসুবিধে এবং তার প্রতিকার ঃ

(১) বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ত। যান্ত্রিক যুগে মানুষ যেন যন্ত্রের মতো কাজ করছে। বিশেষত হিন্দুসমাজ ব্যবস্থায় মানুষ ধর্মের চেয়ে কর্মের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়।

(২) অন্যান্য অঞ্চলের মতো বরাক উপত্যকার বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মানুষ বিশেষ করে হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য উপধর্মের প্রতি ঝোঁক বাড়ার ফলে বৈষ্ণবধর্ম ও আখড়ার দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন অনুভব করেন না।

(৩) বর্তমান সময়ে প্রত্যেক মানুষই শিক্ষিত। সবাই যেন জৌলুষপূর্ণ কিংবা চাকচিক্য সৌন্দর্যের প্রতি ধাবিত। কিন্তু আখড়ার নিয়মকানুন সবই পুরানো পদ্ধতিতে প্রচলিত এবং আখড়ার বৈষ্ণব-বাবাজিরা সাধারণত অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত থাকেন। তাঁরা সদায় কৃষ্ণ ভজনায় ব্যস্ত থাকেন। মানুষকে আকর্ষণ করার মতো ভাবভঙ্গি তাঁদের নেই কিংবা তাঁরা এসব পথে পা মাড়ান না।

(৪) আখড়ার বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ভক্ত সমাজের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ালে প্রয়োজন মতো ভিক্ষা সংগ্রহ করতে পারেন না। অতি কষ্টে তাদের জীবনযাপন অতিবাহিত হয়।

(৫) বর্তমান সময়ে সাধারণ জনগণ রুটি-রোজগারে ব্যস্ত থাকলেও একশ্রেণির মানুষ বিনা কষ্টে টাকা উপার্জন করতে চায়। তারা নানা কৌশল অবলম্বন করে টাকা উপার্জনের জন্য। আখড়ায় রয়েছে প্রচুর জমি ও ধনসম্পত্তি। একদল মানুষ এইসব ধন-সম্পত্তি ও জমিজমা ভোগ করার জন্য আখড়ার সেবায়েতদেরকে একপাশে রেখে গঠন করেন পরিচালন সমিতি। আর এই পরিচালন সমিতি নিজ ইচ্ছেমতো আখড়ার সবকিছু ব্যবহার করেন। প্রয়োজনবোধে সেবায়েতদেরকে নানা অজুহাত দেখিয়ে বের করে দেওয়া হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষায় গিয়ে এ ধরণের নানা অভিযোগ বৈষ্ণবদের কাছে থেকে পেয়েছি। তবে বেশির ভাগ পরিচালনা কমিটি অত্যন্ত সুদক্ষভাবে আখড়া পরিচালনা করছেন।

(৬) অনেক ব্যক্তিরা আখড়ার জমি দীর্ঘদিন থেকে চাষ করেন কিন্তু উৎপন্ন ফসলের কতটুকু আখড়ায় প্রদান করেন, এর কোনো হিসেব নেই। অনেকেই আবার আখড়ার জমিজমা নিজের নামে নামজারি করে নিয়েছেন।

(৭) অনেক ক্ষেত্রে এসবের উল্টো ঘটনাও দেখা যায়। আখড়ার বৈষ্ণব নানা কৌশল অবলম্বন করে আখড়ার জমি বিক্রি করে দেন। তবে এ ধরনের ঘটনা হাজারে একটি ঘটে।

(৮) আখড়ার উন্নয়নের কিংবা অস্তিত্ব রক্ষার্থে সবচেয়ে বড় বাধা সরকার কর্তৃক কোনো সাহায্য না-পাওয়া। কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা শাসক শ্রেণি বা সরকার আখড়ার উন্নয়নে সাহায্য প্রদান করে না। ব্যক্তিগত স্তরে দু-একজন হয়তো যৎসামান্য সাহায্য করেন। ক্ষেত্র সমীক্ষায় গিয়ে এ ধরনের অনেক কথা আমাকে শুনতে হয়েছে। অনেক বৈষ্ণব-বাবাজি প্রশ্ন করেছেন 'এসব সমীক্ষার পর আমরা আখড়ার উন্নতির জন্য সরকার থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে নাকি?' উত্তর আমাদের জানা নেই।

প্রতিকার বা সমস্যা সমাধানের উপায় ঃ

(১) সমাজের প্রতিজন ব্যক্তি নিজ আয়ের এক শতাংশ হলেও যেন আখড়া কিংবা বৈষ্ণব-বাবাজিদেরকে দান করেন। দৈনন্দিন পুজোর ফলমূল ও অন্যান্য সামগ্রী তাঁরা ক্রয় করতে পারবেন। এ ছাড়া সুস্থভাবে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ক্রয় করার সুবিধা হবে।

(২) আখড়ার নিজস্ব জমিজমা ও ধনসম্পত্তি সুরক্ষিত রাখতে পারলে সেবায়েতদের অনেক অসুবিধে দূর হবে। সেইসঙ্গে যারা আখড়ার জমি চাষ করেন তারা যেন অর্ধেক ফসল আখড়ায় জমা দিলে সামগ্রিকভাবে আখড়ায় উন্নতি হবে।

(৩) সরকার কর্তৃক আখড়ার উন্নতির জন্য যথাযথ আর্থিক সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন।

(৪) আখড়ার বৈষ্ণব কিংবা বৈষ্ণবী নিজ নিজ প্রচেষ্টায় যেসব সাহিত্যিক প্রতিবেদন কিংবা কবিতা (পদ) রচনা করেছেন এসব সর্বসাধারণের সামনে তোলে ধরার জন্য ছাপার ব্যবস্থা করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

(৫) আখড়ার ইতিহাস কিংবা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে এক বৃহৎ পরিকল্পনা আমাদের নিতেই হবে। এই পরিকল্পনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল প্রতিটি আখড়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখা। প্রয়োজনে পরবর্তী কিংবা উত্তরাধিকারীরা এ বিষয়ে যেন জ্ঞাত থাকতে পারেন।

উপসংহার

বরাক উপত্যকা দীর্ঘকাল থেকে বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকার ফলে নদীয়ায় মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই দুই বঙ্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থানে কোনো হেরফের হয়নি। ঠিক তেমনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিচার করলে দেখা যায়, বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর আদি দিন থেকে প্রচলিত। বিষ্ণু বৈষ্ণব ধর্মের আদি পিতা হিসেবে স্বীকার করলেও পরবর্তী সময়কালে বৈষ্ণবধর্মের চারটি শ্রেণি আমরা পেয়েছি। এরপরে এই চারশ্রেণির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এক নতুন বৈষ্ণব মতের প্রচার শুরু করেন। মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে কোনো জাতিভেদ কিংবা সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। যেকোনো সম্প্রদায়ের লোক স্বইচ্ছায় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করতে পারেন। মহাপ্রভুর সার্বিক আহ্বানে হাজার হাজার অহিন্দু বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন।

সমাজের ভাঙনের সময় মহাপ্রভু শক্ত হাতে আমাদের সমাজকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবিত কালেই কিংবা পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণবধর্ম নানা-উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদ আবার নবরূপে মাথাছড়া দিয়ে ওঠে। আবার অনেক বৈষ্ণবসম্প্রদায় জাতপাতের উর্ধে ওঠে এক নতুন সমাজ গঠনে এগিয়ে আসেন।

বরাক উপত্যকার বিভিন্ন আখড়ায় বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈরাগী বা বৈষ্ণব মহাপ্রভু ও কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। এসব আখড়া সমাজে নানা উন্নয়নে যেমন সচেষ্ট তেমনি ধর্মীয় নানাকাজে তারা নিয়োজিত। আখড়ার বৈষ্ণব সমাজের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও কাজকর্মের ফলে সমাজ যেন এক নতুন পথের দিশায় হাটছে। আবার এইসব আখড়াকে কেন্দ্র করে নানা উৎসব-অনুষ্ঠান পালন হওয়ার ফলে নানা শ্রেণির মানুষ এক জায়গায় মিলিত হতে পারে। ফলে প্রত্যেকের মনের ভাব আদানপ্রদান করার এক মহাসুযোগ আসে। আখড়াকে কেন্দ্র করে যেসব মেলা বা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাতে মানব সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক স্তরে প্রচুর উন্নতি ঘটে। শুধু ধর্মীয় বা সামাজিক নয়; আর্থিকভাবে অনেকেই লাভবান হন।

বর্তমান সময়ে আখড়া ও বৈষ্ণব সমাজের সামনে প্রচুর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যান্ত্রিক যুগের কবলে পড়ে মানুষ যেন এক আধুনিক যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মকর্ম কিংবা সমাজের প্রতি সময় দেওয়ার কোনো

সুযোগ নেই। প্রায় মানুষই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আখড়ার ঐতিহ্য বজায় রাখতে হলে আমাদেরকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে সরে এসে দাঁড়াতে হবে। তবেই আখড়ার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। সেইসঙ্গে আমাদের বর্তমান সঙ্কটপূর্ণ অবস্থান থেকে মুক্তি পেতে পারি।

পরিশিষ্ট

ক্ষেত্র সমীক্ষায় যাঁদের সাহায্য আমি পেয়েছি ঃ

১। মানস কান্তি চক্রবর্তী, কালাইন, কাছাড়।

২। শশধর মালাকার, লারছিংপার, কাছাড়।

৩। সুশীল চন্দ্র দাস, উত্তর কাঞ্চনপুর-২য়, হাইলাকান্দি।

৪। অজিতকুমার সিংহ, আমতলা (কাটলিছড়া), হাইলাকান্দি।

৫। রিঙ্কু মালাকার, ফকিরাবাজার, করিমগঞ্জ।

গ্রন্থপঞ্জী

১। অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি ঃ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ), ২০১০, কথা, কলকাতা-২০১০।

২। অনিলকুমার সেনগুপ্ত ঃ হিন্দুধর্মে জাতিবর্ণভেদ ও বৌদ্ধধর্ম, ২০০৪, বাউলমন, কলকাতা-১৯।

৩। অজিতকুমার সিংহ ঃ মালাকার সম্প্রদায়ের ইতিহাস ঃ বরাক উপত্যকা, ২০১১, ভিকি পাবলিকেশ্‌ন, গুয়াহাটি-৭।

৪। অমলেন্দু ভট্টাচার্য ও অন্যান্য (সম্পা.) ঃ শ্রীহট্ট - কাছাড়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা, ১৯৯৬ শিলং।

৫। অবন্তীকুমার স্যানাল ও অশোক ভট্টাচার্য (সম্পা.) ঃ চৈতন্যদেব ঃ ইতিহাস ও অবদান, ২০০২, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা-৬।

৬। উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ ঃ কাছাড়ের ইতিহাস, ১৯৭১, অসম প্রকাশন পরিষদ, গৌহাটি-৩।

৭। শ্রী গোপালগোবিন্দ ভট্টাচার্য ঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সাধনা, ২০১৩, গিরিজা লাইব্রেরী, কলকাতা-৯।

৮। জন্মজিৎ রায় ঃ শ্রীহট্ট কাছাড়ের ভাষা, সাহিত্য সমাজ, ২০১৩, অক্ষর পাঃ, কলকাতা-১২।

৯। দীনেশচন্দ্র সেন ঃ হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণব ধর্ম, ১৪২০, পাতাবাহার, কলকাতা-৯।

১০। ননীগোপাল গোস্বামী ঃ চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, ১৪০৭, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯।

১১। নীহার ঘোষ ঃ বাংলার মন্দির শিল্পশৈলী (অন্ত মধ্যযুগ), ২০১২, অমর ভারতী, কলকাতা-৯।

১২। নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙ্গালীর ইতিহাস, ১৪১২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩।

১৩। পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ঃ বাংলার বৈষ্ণবধর্ম, ১৪১৯, পাতাবাহার, কলকাতা-৯।

১৪। মিহির ভট্টাচার্য ঃ ভাষা জাতি রাষ্ট্র, ২০০৩, উবুদশ, কলকাতা-১২।

১৫। রমাকান্ত চক্রবর্তী ঃ বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, ২০১১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯।

১৬। রমাপ্রসাদ চন্দ্র ঃ গৌড়রাজমালা, ১৯১২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩।

১৭। শশীভূষণ দাশগুপ্ত (মূল) এবং গোপীমোহন সিংহরায় (অনুবাদক) ঃ বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা, ২০১১, ভারবি, কলকাতা-৭৩।

১৮। শিবতপন বসু ঃ বরাক উপত্যকার মুসলিম সমাজ (১ম খণ্ড), ২০০৪।

১৯। ড° ষষ্ঠীচরণ ভট্টাচার্য ঃ বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি, ২০০১, পুনশ্চ, কলকাতা-৯।

আকরগ্রন্থ ঃ

১। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৩০।

২। বৃন্দাবন দাস ঃ শ্রীচৈতন্যভাগবত, ১৩৫৬, অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী।

Books (English) :

1. A. K. Borkakaty : Census-1971 (Dist. Census Handbook - Cachar District - S.3), 1983, Guwahati.

2. B.C. Allen : Assam District Gazatters - Vol. 1 (Cachar), 1905, District Gazatters, Assam.

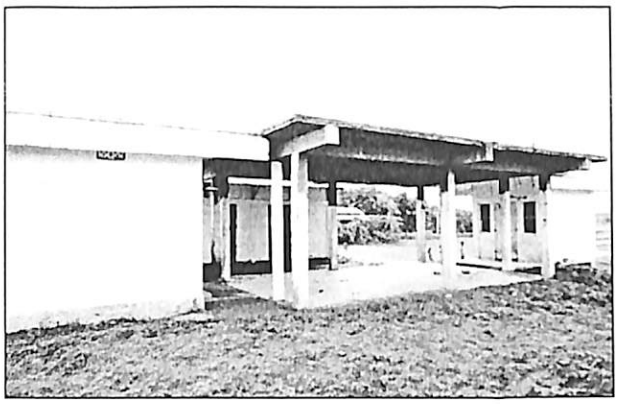

জগন্নাথ মহাপ্রভুর আখড়া, আনোয়ারপার

শ্রীঠাকুর জগন্নাথ আশ্রম, আনোয়ারপার

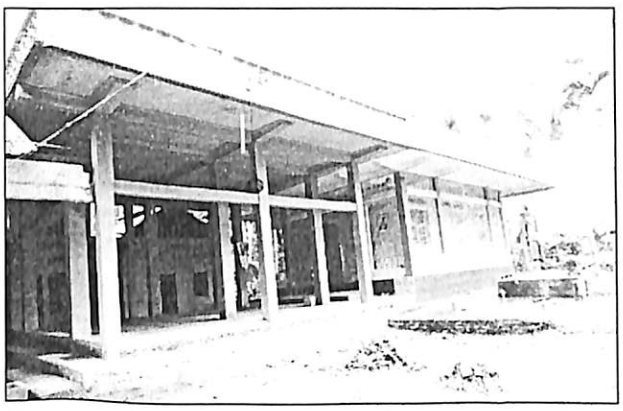

শ্রীগোপালগোবিন্দ জিউর আখড়া, কালীনগর

শ্রীরাধামাধব আখড়া, পাঁচগ্রাম

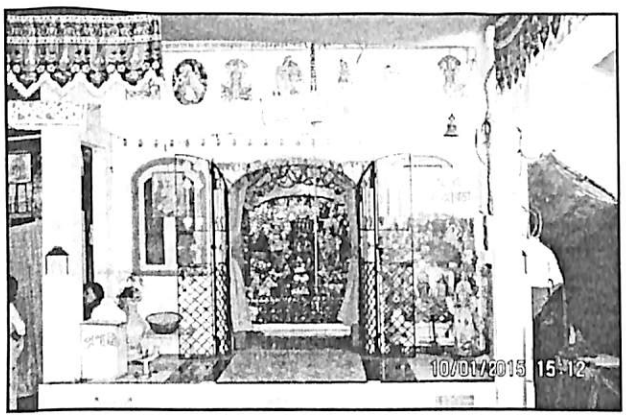

শ্রীমহাপ্রভু ও রাধাগোবিন্দ আখড়া, পালইছড়া

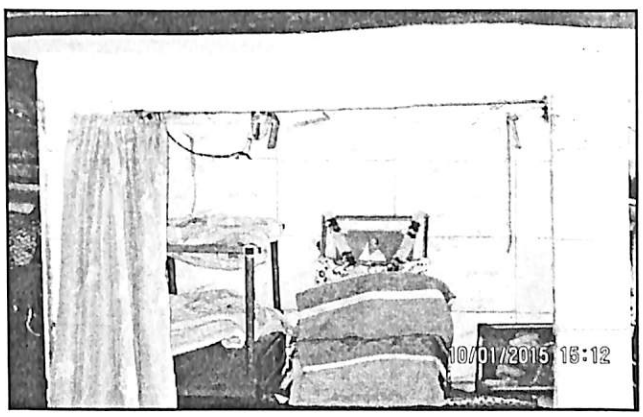

বালিরবন্দ আখড়া, বাগান বস্তি

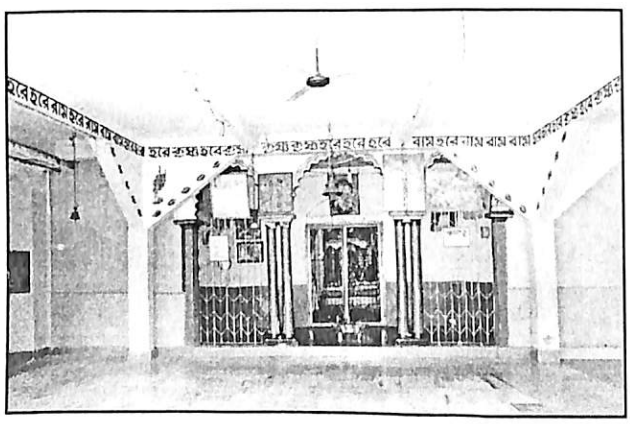

শ্রীশ্রীগোপাল জিউ রাধারমণ জিউ আশ্রম, মাধবপুর

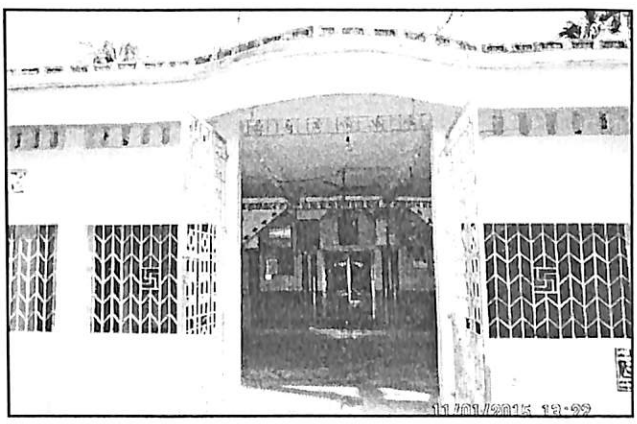

মদনমোহন আখড়া, মাধবপুর

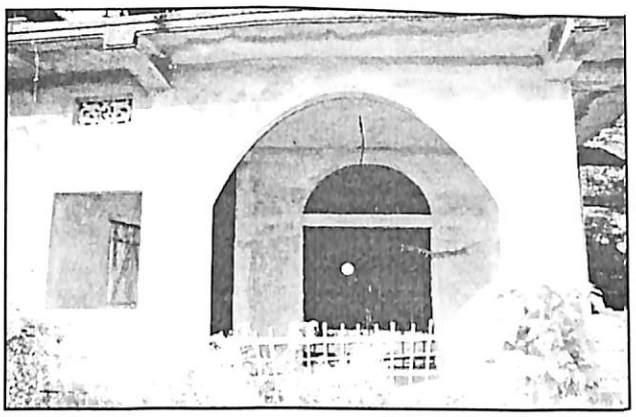

প্রমোদনগর আখড়া, কদমতলা

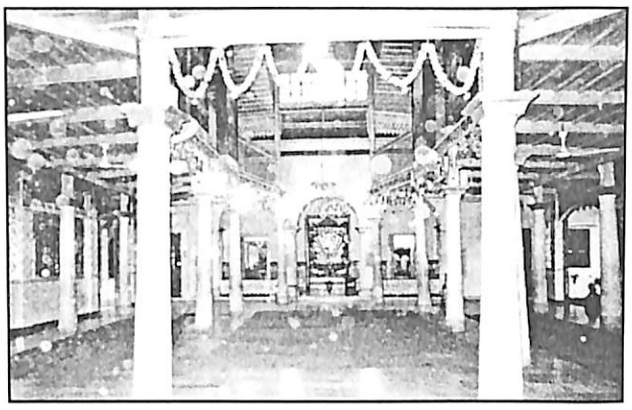

মহাপ্রভুর আখড়া, কাটলিছড়া

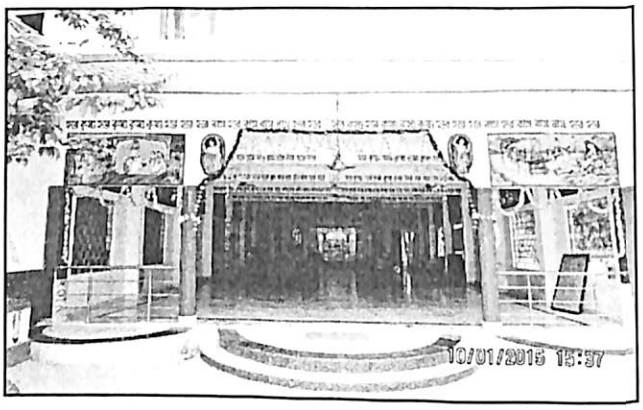

গৌড়ীয় মঠ, লালাবাজার

শ্রীশ্রীনিতাই গৌর আশ্রম, লালাবাজার

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরসুন্দর আখড়া, লালাবাজার

রামগোপাল আশ্রম, লালাবাজার

রাধামাধব আখড়া, লালাবাজার

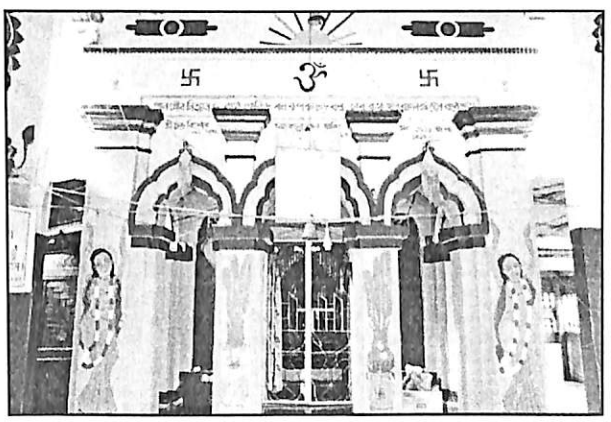

শ্রীশ্রীষড়ভোজ মহাপ্রভুর আখড়া, লালাবাজার

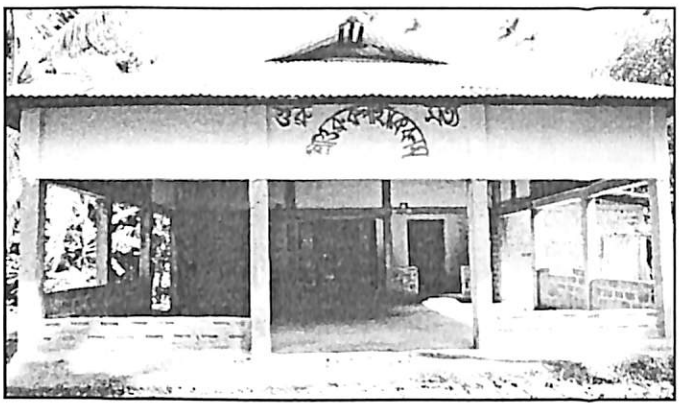

শ্রীশ্রীরাধারমণ রাধাগোবিন্দ মঠ, লালাবাজার

হাইলাকান্দি বাজার আখড়া

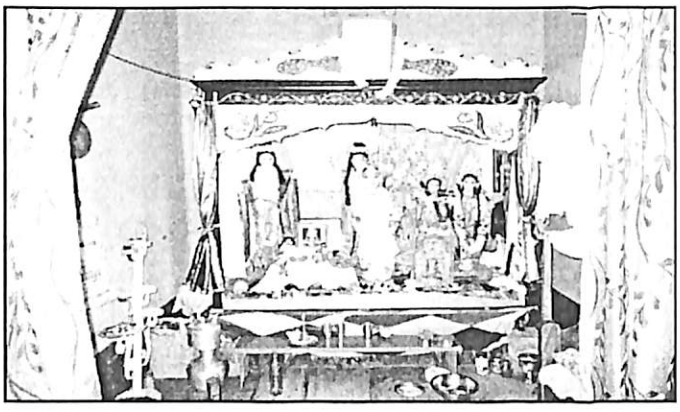

শ্রীশ্রীরাধারমণ আশ্রম, হাইলাকান্দি

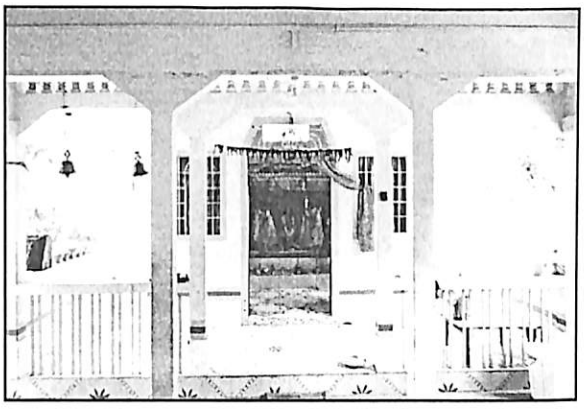

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির, হাইলাকান্দি

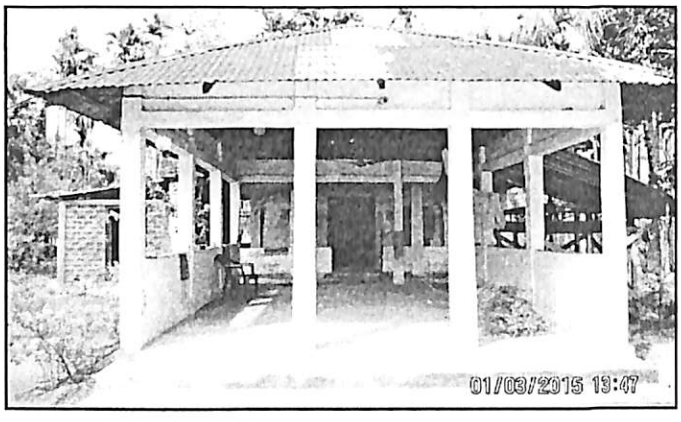

জগন্নাথ আশ্রম, ঘোড়ামারা

বলরাম আশ্রম, লালচক

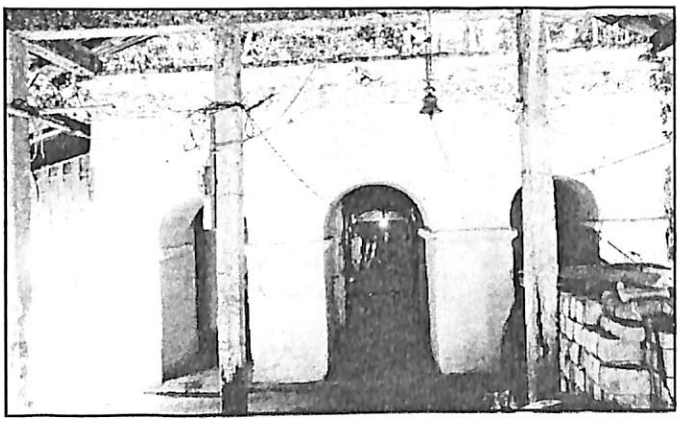

পঞ্চবটী আখড়া বা ব্রহ্মানন্দ জিউর আখড়া, বরকতপুর

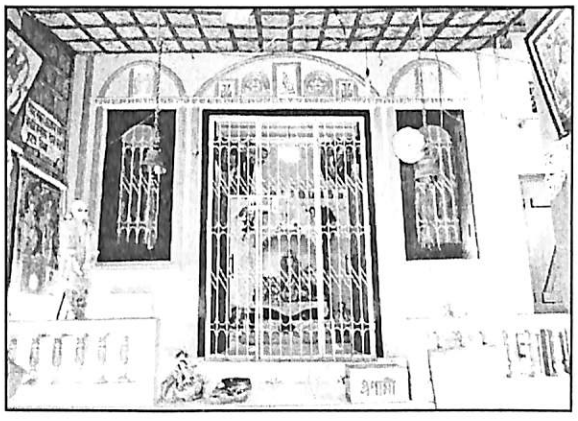

ঠাকুর ভগবানের আখড়া

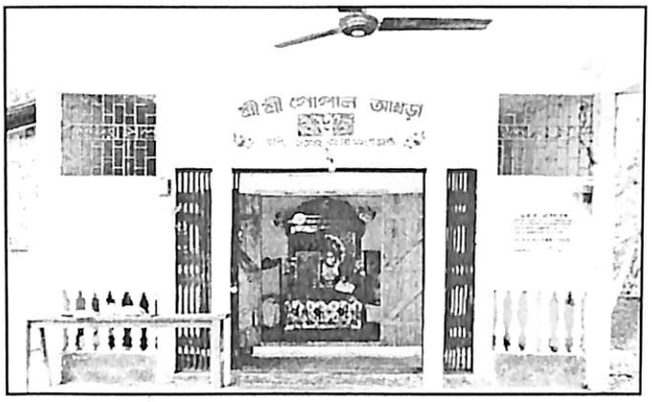

শ্রীশ্রীগোপালের আখড়া, চরগোলা

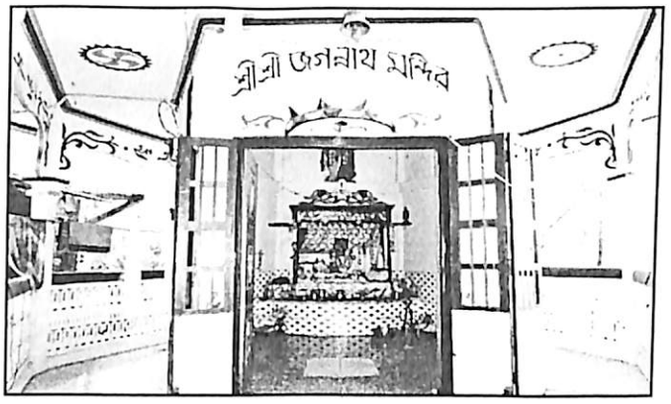

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির, নন্দপুর

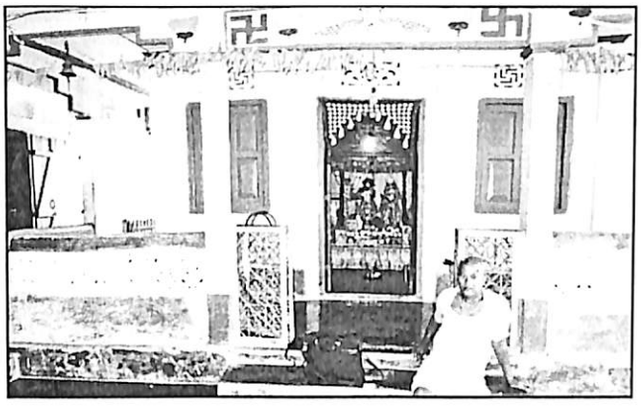

জগন্নাথ মহাপ্রভুর মন্দির, মালুয়া

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জিউর আখড়া, মালুয়া

নীরদা আশ্রম, শ্রীগৌরী

শ্রীশ্রীনরসিংহ প্রভুর শ্রীমন্দির, সজপুর

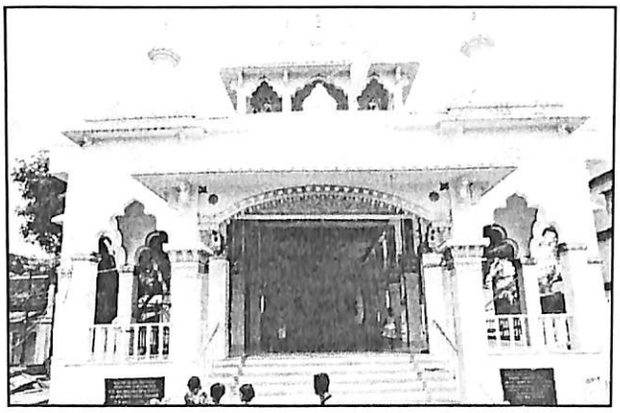

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জিউর আখড়া, করিমগঞ্জ

রাধামাধব আশ্রম, কাটিগড়া

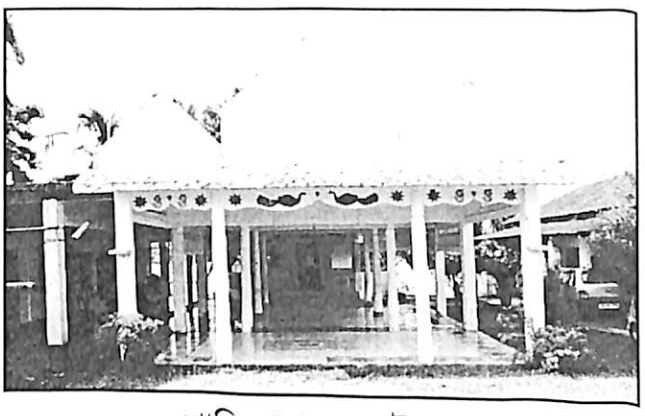

শান্তি আশ্রম, কালাইন

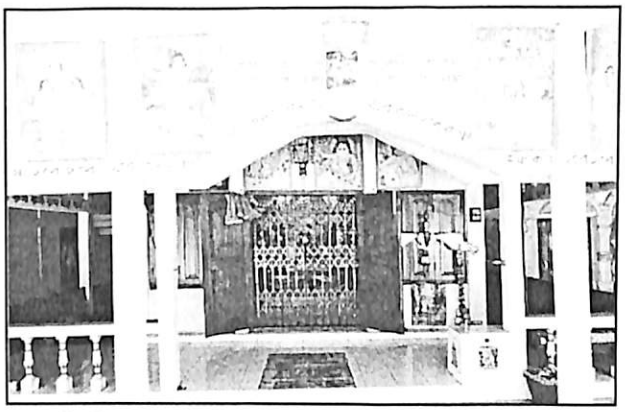

শ্রীশ্রীজগবন্ধু মদনমোহন জিউ আখড়া, বড়খলা

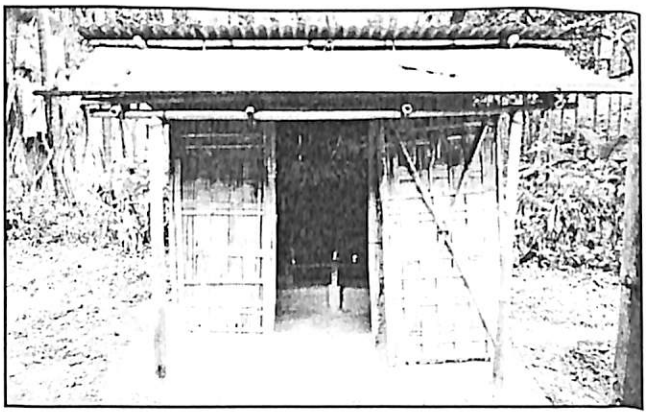

শ্রীশ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আশ্রম, ধলাই

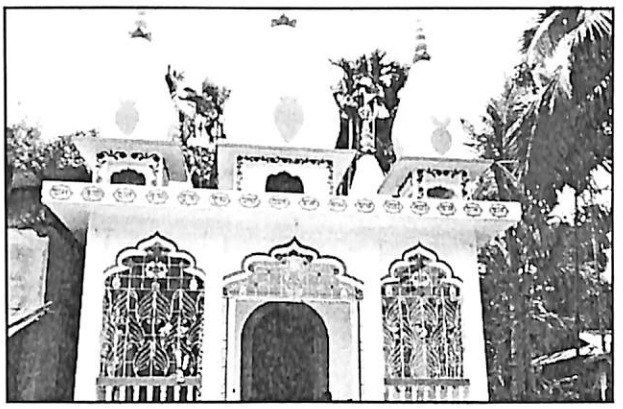

শ্রীশ্রীরাধাসুদর্শন মন্দির, ঘুংঘুর

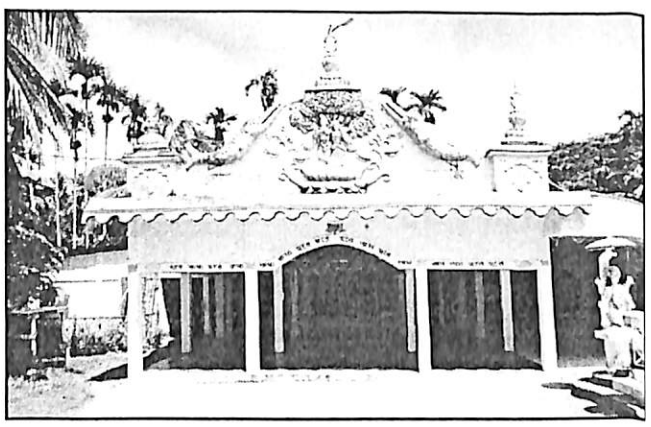

শ্রীশ্রীরাধামাধব জিউর বিগ্রহ, শিলচর

দুধপাতিল সর্বজনীন বড় আখড়া, উধারবন্দ

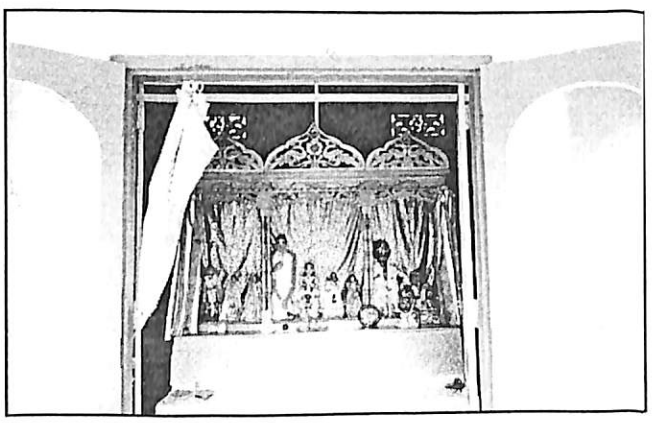

দিলখুশ আখড়া, লক্ষ্মীপুর

ফুলেরতলের আখড়া, উধারবন্দ